অনন্ত সিংহ

আমি সেই মেয়ে

আমি সেই মেয়ে

অনন্ত সিংহ

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

উৎসর্গ

১৯২৩ সালে 'নাগারখানা' যুদ্ধে সশস্ত্র পুলিশ বেষ্টিত পাহাড় থেকে কে তুমি হে রাখাল ভাই, আমাদের তিনজনকে অতি সংকট মুহূর্তে অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে উদ্ধার করেছিলে? কে হে তুমি অতি দরদী বৃদ্ধ কৃষক ভাই, তোমারই বিভীষণ-সম আত্মীয়-পরিজনদের কোপদৃষ্টির অন্তরালে সকল বিপদকে তুচ্ছ ক'রে একটি মাটির ঘরে মাচার ওপর 'তিনজন সশস্ত্র স্বদেশী ফেরারী'কে চার-চারটি দিন সর্বক্ষণের জন্য গোপন আশ্রয় দিয়েছিলে?

স্বাধীনতা যুদ্ধে হে আমার দরদী বন্ধুরা! ফেণী সংঘর্ষের পর কে হে তুমি তোমার ঢেঁকিঘরে গোপনে সযত্নে আমাকে রেখেছিলে? বিলোনিয়ার হে আমার সুরেন ভাই! তোমাদের কারো সঙ্গে দেখা আর হ'ল না—জীবনে দেখা আর কখনও হবেও না, তবু যতদিন বেঁচে আছি তোমাদের অক্ষয় স্মৃতির অমোঘ মোহন সুর বাজবে আমার হৃদয়-বীণায়!

আমার এই ছোট পুস্তকটি তোমাদের মধুর স্মৃতির উদ্দেশেই উৎসর্গ ক'রে আজ আমি হলাম ধন্য।

ফাঁসীর পাঁচ ঘণ্টা পূর্বে

"আমার শেষ বাণী—আদর্শ ও একতা। ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার উপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলছে। এই ত' সাধনার সময়। বন্ধুরূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার এই ত' সময়। ফেলে আসা দিনগুলোকেও স্মরণ করার এই ত' সময়।

"কত মধুর তোমাদের সকলের স্মৃতি। তোমরা আমার ভাই-বোনেরা তোমাদের মধুর স্মৃতি বৈচিত্র্যহীন আমার এই জীবনের এক-ঘেয়েমিকে ভেঙ্গে দেয়। উৎসাহ দেয় আমাকে। এই সুন্দর পরম মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য দিয়ে গেলাম—স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। আমার জীবনের এক শুভ মুহূর্তে এই স্বপ্ন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। জীবন-ভোর উৎসাহভরে ও অক্লান্তভাবে পাগলের মতো সেই স্বপ্নের পেছনে আমি ছুটেছি। জানিনা কোথায় আজ আমাকে থেমে যেতে হচ্ছে। লক্ষ্যে পৌছানর আগে মৃত্যুর হিমশীতল হাত আমার মতো তোমাদের স্পর্শ করলে তোমরাও তোমাদের অনুগামীদের হাতে এই ভার তুলে দেবে, আজ যেমন আমি তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। আমার বন্ধুরা—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল—কখনো পিছিয়ে যেওনা। পরাধীনতার অন্ধকার দূরে সরে যাচ্ছে। ঐ দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার নবারুণ। কখনো হতাশ হয়ো না। সাফল্য আমাদের হবেই। ভগবান আশীর্বাদ করুন।
...."

"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

মাস্টারদার শেষ বাণী। বন্দেমাতরম্।"

ভূমিকা

আমার প্রিয় ভাই অনন্তের ইচ্ছা, আমিই যেন তার এই বইয়ের ভূমিকাটি লিখি। সে সব সময়ে আমার কাছে অনন্তই ছিল। তাকে আমি ১৯২১-২২ সাল থেকে বিশেষভাবে চিনি। সে একেবারে নাছোড়বান্দা—একবার যখন সে ধরেছে, তখন আমাকেই ভূমিকাটি লিখতে হবে তা বুঝেছি।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ নিয়ে লেখা তার চারটি গ্রন্থই খুব মনোযোগ সহকারে আমি পড়েছি। তার জীবনের বহু ঘটনাবলী ও শ্রদ্ধেয় মাষ্টারদার নেতৃত্বে যে একটি শক্তিশালী বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে আমি নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলাম। সেই কারণে সেই সংগঠনের প্রায় সব তথ্যই আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল। সংগঠনের মধ্যে ও ছয় বৎসরের অধিককাল জেলে বন্দী থাকাকালে তাদের অনেকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছি। জেল জীবনে তাদের প্রত্যক্ষ বিপ্লবী ষড়যন্ত্রমূলক বীরত্বপূর্ণ কাজের লোমহর্ষক ও উৎসাহব্যঞ্জক জীবন্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানার সুযোগ আমার হয়েছে—এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজ মুখেই সব ঘটনা বলেছে ও তাদের নিজ নিজ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে প্রাঞ্জলভাবে সেই সব ঘটনা প্রকাশ করেছে।

ঐরূপ অনন্তের কাছেও আমার অনেক অনেক জানার ও শোনার সুযোগ হয়েছে—বলতে গেলে তারই মুখে সবার

চাইতে অনেক বেশী শুনেছি।—শুনেছি তার নিজের মুখের আত্মসমালোচনা; তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বলিষ্ঠ আত্ম-বিশ্লেষণ আমাকে মুগ্ধ করতো। তাকে আমি অন্যদের সম্বন্ধে এও বলতে শুনেছি—"সতীদা, কার সমালোচনা করব? কারা আমার সম্বন্ধে কি বলে—দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্যে কে কি প্রচার ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তার আমি কি উত্তর দেব? একাগ্রমনে নিঃস্বার্থভাবে যদি সৎকর্মে দৃঢ় থাকি এবং যথার্থ কর্মের যদি জয় হয়, তবেই তাদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সেটিই হবে উপযুক্ত জবাব।" এইরূপ নানা কথাই সে আমাকে বলত। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাকে আকৃষ্ট করত। তাকে দেখেছি, সে কখনো মিথ্যা বলবে না বা লিখবে না বা কোনো কিছু অতিরঞ্জিত করবে না। বিশেষ ক'রে, নিজেদের সংগঠনের ও বিভিন্ন বিপ্লবী নেতা বা কর্মীর দুর্বলতা ঢেকে রেখে মিথ্যা বড়াই ও আজগুবি প্রচার একটুও সে পছন্দ করত না। ভারতের ও বাংলার বিপ্লবী নেতাদের প্রতি সে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করত, এবং মাঝে মাঝে তাঁদের প্রতি খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে ব্যথিত হৃদয়ে অনুযোগও করতে তাকে আমি শুনেছি—"সতীদা, যাঁরা বড়ো, সত্যিই যাঁরা বড়ো তাঁদের ভয় কি, তাঁরা কেন নির্ভীকভাবে নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে সমালোচনা করতে পারবে না? দুর্বলতা, দোষত্রুটি প্রভৃতি বেমালুম চেপে রেখে, তথাকথিত গৌরবের মিথ্যা প্রচার ক'রে কি তাঁরা ভবিষ্যৎ তরুণদের একটুও বাস্তব শিক্ষা দিতে পারবেন? আমার নিজের হয়ত ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্ব পালন করার সামর্থ্য কোনোদিন বা কোনো কারণে নাও থাকতে পারে, তবু উৎকর্ষ সাধন করেও কি আমি বলতে পারব না: 'আমি ভাই পারছি না বর্তমানের সঙ্গে পা ফেলে চলতে, তবু

আমার মানসিক সমর্থন সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছে—বর্তমান প্রগতির জয়যাত্রার সঙ্গে আমার মন তোমাদের সাথে সাথেই থাকবে ' ?"

দুর্বলতার বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়তে অনন্তকে আমি দেখেছি। আরও বিশেষ লক্ষ্য করেছি—মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত প্রচার সে সর্বতোভাবে পরিহার করত। ভূমিকা লিখতে গিয়ে এতগুলো কথা লেখকের সম্বন্ধে বললাম কেবলমাত্র একটি কারণে যে, এই ছোট বইতে সে বহু ঘটনার উল্লেখ করেছে, যা পাঠকবর্গের কাছে অবিশ্বাস্য, মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত বলে মনে হতে পারে, যদিনা তারা জানেন যে অনন্তের পক্ষে সেইরূপ মিথ্যা বানানো গল্প লেখা একেবারে তার স্বভাববিরুদ্ধ।

অনন্ত সব সময়েই খুব ভাবপ্রবণ। তা অবশ্য তার সব কয়টি বইতে দেখতে পাই যে সে নিজেই লিখেছে তার ভাবপ্রবণতার কথা। কোনো কথা গোপন না করে, সে সবই খুলে লিখেছে। এই বইটিতেও সে তার ভাবোচ্ছ্বাস ও মনের অভিব্যক্তিগুলি সবই দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করেছে। তাছাড়া ভাবপ্রবণ মনের একটি বিশেষ তত্ত্বকথাও সে বলেছে, যার সত্যতা বা যুক্তি আমরা বোধ হয় সহজে অস্বীকার করতে পারব না।

তার এই ছোট বইয়ের মূল্যবোধ আমার কাছে অত্যন্ত বেশী। সে কেবল শ্রীমতী উষা সম্বন্ধেই লিখে ক্ষান্ত হয় নি, সেইসঙ্গে অনুরূপ অনেক স্মৃতির ও জীবনের অনেক নাটকীয় বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করেছে। সেইসব বাস্তব চিত্রের সমষ্টিগত প্রভাবের যেন আজ খুবই প্রয়োজন ছিল। একজন বিপ্লবীর জীবনে এতগুলো সংকট মুহূর্ত, অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ঘটনা, আর কারো আছে কিনা জানি না। প্রত্যেকটি

লোমহর্ষক ও রোমাঞ্চকর ঘটনাই সত্য, এবং এত সত্য যে ঔপন্যাসিকের কল্পনাকেও ম্লান করে দেয়।

আমরা দেখতে পাই, সচরাচর কোনো লেখক বই লিখতে বসে কতগুলি প্রচলিত প্রথা অনুসরণ না করেই যেন পারেন না। বিশেষতঃ এই ধরনের ছোট বা বড়ো গ্রন্থ লিখতে হলে প্রথমেই দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে আরম্ভ করেন। এবং হয়ত আইরিশ ও ইতালীয় মুক্তি-যুদ্ধের কিছুটা অংশ কিংবা আমেরিকা ও ফরাসী বিপ্লবের পটভূমি তুলে ধরে রূপ দেবার চেষ্টা করেন তাঁর সেই বইয়ের। আমি বলছি না এই ধরনের প্রচলিত প্রথায় পুস্তক প্রণীত করা সবাইকে সব সময় বিসর্জন দিতে হবে। কিন্তু যার ভাণ্ডারে প্রকৃত বিপ্লবী ঘটনাবলী স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে, সেইরূপ কোনো বিপ্লবী লেখক কি বইয়ের পাতা গতানুগতিক প্রথায় বৃদ্ধি ক'রে তাঁর যথার্থ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন? আমি অনন্তকে দেখেছি সে আনুষঙ্গিক প্রচলিত প্রথার বেশ ব্যতিক্রম।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের চার খণ্ড (অবশ্য বিভিন্ন নামে), লেখার সময় আমার সঙ্গে অনন্ত প্রায়ই দেখা করত এবং বলত: "সতীদা, রাউলাট কমিটির রিপোর্ট ও কয়েকজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্‌দের ইতিহাসের পাতা উল্টে ভারতের অগ্নিযুগের কয়েকটি অধ্যায় বা স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে চেষ্টা করা যায়, কিন্তু তাতে কি একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা হবে? তাছাড়া সেইরূপ ইতিহাস হবে অন্যের মুখে শোনা কথার বা বইয়ের পাতা দেখে দেখে লিখে দেওয়া বই। সেইসব সমষ্টিগত লিখিত পাতা থেকে নেওয়া বা বিভিন্ন লোকদের বক্তব্য সম্বলিত ক'রে একটি বই লেখা বা প্রকাশ করা যায়। কিন্তু ঐসব ধার করা তথ্য

দিয়ে যদি বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করি, তবে তো বহু ঘটনা, বহু তথ্য, বহু সমর্থকদের অশেষ স্বার্থত্যাগের বিষয় ও নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বাদ পড়ে যাবে। আমার কয়েকজন অভিজ্ঞ সমর্থক এবং সাত আটজন প্রখ্যাত অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত জানিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা অন্যান্য দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস ও বিভিন্ন বীরত্বের কাহিনী সেইসব বই থেকেই পড়ে নেবেন। কিন্তু তাঁরা বিশেষ আগ্রহী চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংগঠনের নানাদিকের তথ্য জানার জন্য। তাঁরা বিশেষ ক'রে জানতে চান আমাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা ; আর আমি যেন দরদী বন্ধু ও সমর্থকদের বিভিন্ন চরিত্র, তাঁদের সাহায্য ও স্বার্থ-ত্যাগের বিশদ বিবরণ দিতে চেষ্টা করি।"

অনন্তের কাছ থেকে এইসব কথা শুনে আমিও তাকে তখন আমার অনুরূপ মতই জানিয়েছিলাম। আমার খুব ভালো লেগেছে সে তার চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সব কয়খানি বইতে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছে এবং খুব সততার সঙ্গে সে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির হৃদয়গ্রাহী মুহূর্তের বৈশিষ্ট্য পরিবেশন করতে একটুও কুণ্ঠিত হয় নি। এই বিরাট, ব্যাপক, সারাভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সফলতার জন্য যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীরত্ব, প্রত্যেকের অবদান, প্রতিটি স্বার্থত্যাগের মহিমা বড়ো না ছোট কর্মীদের সর্বপ্রকারের নিদর্শন আমরা কোনোটাই অবজ্ঞা করতে পারি না। অন্তর দিয়ে সবার অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব এবং তাদের জানাব আমাদের নমস্কার। অনন্তের লেখার মধ্যে, এই ছোট বইটিতেও, তার সেইরূপ চেষ্টার অভাব দেখি নি। তার বাস্তব উপলব্ধির মধ্যে ফুটে উঠেছে সেই সত্যটি—ভারতের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সবার ত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, আত্মবলিদান, সাহায্য প্রভৃতির স্থান

থাকবে—সে যতই নগণ্য হোক না কেন বা তার অবদান যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন।

আজ আমার এই বৃদ্ধ আশি বছর বয়সে, এই বইয়ের ভূমিকা লিখতে গিয়ে খুবই আনন্দ পেয়েছি। আমার শুভকামনা, অনন্তের প্রয়াস সফল হোক। পাঠকবর্গের এই বইটি পড়তে খুব ভাল লাগবে বলে আমার বিশ্বাস।

শ্রীসতীভূষণ সেন

মুখবন্ধ

'আমি সেই মেয়ে!' কে সেই মেয়ে, নাম কি তার, কিইবা তার পরিচয়? তিনি কি সঙ্গীত জগতের খ্যাতনামা শিল্পী? নাকি তিনি রঙ্গমঞ্চের যুগান্তকারী কোনো এক নর্তকী বা অভিনেত্রী? ছায়াচিত্রের রঙিন পর্দার শ্রেষ্ঠ চিত্র-তারকার আসন কি তিনি কোনো কালে অলং-কৃত করেছেন? পাঠকবর্গ সেইরূপ একটি কল্পনাপ্রসূ মন নিয়ে যদি 'সেই মেয়ে'র মরীচিকার পেছনে ছোটেন, তবে আমার এই লেখা সত্যই তাদের নিরাশ করবে।

আবার যদি অগ্নিযুগের শৌর্য-বীর্য ও চরম স্বার্থত্যাগ প্রভৃতির ইতিহাসের পাতায় 'সেই মেয়ে'কে খুঁজি, তবে কি বাংলার গৌরব ও মহামহিমান্বিতা প্রীতিলতা, কল্পনা, শান্তি, সুনীতি, বীণা, এবং আরও অনেক বিপ্লবী বোনেদের পাশে তাঁকে দেখতে পাব?

দেখতে পাব কি সেই অগ্নিযুগে ইংরেজ শাসকবর্গের বিরুদ্ধে প্রতিশোধপরায়ণা হয়ে রিভলভার হাতে তিনিও ছুটছেন? ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তিনি কি সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন? তিনি কি ষড়যন্ত্রমূলক বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য ব্রিটিশ আদালতে দণ্ডিত হয়েছেন? জেল-জীবনে তাঁর কি কোনো উৎসাহ-ব্যঞ্জক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে যা আমাদের প্রেরণা যোগাতে পারে—স্বার্থত্যাগের আদর্শে আমাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে? এইরূপ একটি কল্পনা-জগতের আবর্তে থেকে যদি কেউ 'আমি সেই মেয়ে' এই ছোট পুস্তকটি পড়েন, তবে তাঁকেও হয়তো খুবই নিরুৎসাহী হতে হবে।

'স্বদেশপ্রেম' বা 'বৈপ্লবিক স্বদেশ প্রেমে'র প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বা মুগ্ধ হয়ে কি 'সেই মেয়ে' ঘরবাড়ি ছেড়ে একটি জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মতো

ছুটে চলেছেন? সংসারের সব মোহ, সব আসক্তি ও সবরকমের আকর্ষণ অতি শৈশবেই কি তিনি ছিন্ন করেছেন? তাঁর পিতামাতার স্নেহ-বন্ধন কি তিনি কাটিয়ে বিপ্লবী দলের গোপন সংগঠনে যোগ দিয়ে এবং শিক্ষা গ্রহণ ক'রে বিপ্লবের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন?

বিপ্লবীদের অসীম সাহস, বিক্রম ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল ইতিহাস আমাদের মনে প্রেরণা যোগায়; তাঁদের পিস্তলের অগ্নিবর্ষণ, সমবেত ও সঙ্ঘবদ্ধ সশস্ত্র আক্রমণ, ফাঁসির মঞ্চে তাঁদের জীবনের জয়গান প্রভৃতি আমাদের মনে উৎসাহ যোগায়—উদ্দীপনার সঞ্চার করে। আবার তাপ-উত্তাপবিহীন অচাঞ্চল্যকর নীরব স্বদেশপ্রেমের সাধনা এবং বিপ্লবের বিজয় অভিযানে তাঁদের নীরব অবদান যার কোনো বাহ্যিক প্রকাশ নেই, তাও আমাদের অন্তরের গভীরে বিশেষভাবে রেখাপাত না করেই পারে না, কিন্তু নীরব সাধনার সমাদর ডঙ্কা বাজিয়ে মহা-উৎসবের মধ্যে সম্পন্ন করার সুযোগ তো পাওয়া যায় না। চোখ ধাঁধানো চাঞ্চল্যকর বৈপ্লবিক ঘটনা যেমন রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে এবং ঐরূপ ঘটনার সঙ্গে যাঁরা জড়িত থাকেন, তাঁদের নামও যেভাবে মুখরিত ও সোচ্চার হয়ে ওঠে, সেইরূপভাবে নীরব বিপ্লবী কর্মীর ও দরদী-সমর্থকদের নীরব সাধনা ও গোপন সাহায্যের তথ্য আমরা যে জানতেও পারি না, যদি নাকি তাঁরা নিজেরা সময় ও সুযোগমতো তা প্রকাশ না করেন।

স্বাধীনতার পূর্ণ ইতিহাস কেবলমাত্র চোখ ঝল্‌সানো চাঞ্চল্যকর কয়েকটি ঘটনার সমন্বয়ে রচিত হওয়া সম্ভব নয়। ভারতের বিরাট ও তীব্র মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কেবলমাত্র একজন সূর্য সেন আর তাঁর সঙ্গে গুপ্ত সমিতির মাত্র গুটিকয়েক সভ্যদের ফাঁসি এবং পুলিশ ও সৈন্য বাহিনীর গুলিতে প্রাণ বিসর্জনের মধ্যে নিবদ্ধ নয়। সেই সব আত্ম-ত্যাগের আদর্শ অবশ্য স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক অনুপ্রেরণা যোগাতে আমাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করেছে, তবে ভারতে মহামানবের মুক্তি সাগরের ইতিহাসে, যদি একটুখানি ভেবে দেখি, তবে দেখব তা একটি

বারিবিন্দু ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতে অনেক বিপ্লবী নায়ক ও মহানায়ক এবং তাঁদের নিজ নিজ বিপ্লবী সংগঠনের সভ্যদের অতুলনীয় সাহস, বিক্রম ও চরম স্বার্থত্যাগ ও প্রাণদান—এই সবটা একত্রে যোগ দিলেও সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের এই বিশেষ চমকপ্রদ অধ্যায়টি কিন্তু বিপ্লবী সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়।

পরস্পর বিরোধী দেশের মধ্যে যখন কোনো যুদ্ধ বাধে, তখন কেবলমাত্র তাদের সৈন্যবাহিনীই সমরাঙ্গনে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, তা নয়, সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন সাহায্যকারী দল পেছনে থাকে। এমন কি, সারা দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাও যুদ্ধের উপযোগী ক'রে সাজাতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব যে, জালালাবাদ যুদ্ধে মাস্টারদার নেতৃত্বে 'ভারতীয় বিপ্লবী গণতন্ত্রী বাহিনী'র বীর সৈনিকরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছে এবং অনেকে সেই যুদ্ধে বরণ করেছে গৌরবময় মৃত্যু। সেই সময়ে বালক টেগরা মহাবিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে অমর হয়েছে। বিপ্লবের বিজয়ের পথে টেগরার আত্মদান যেরূপ গৌরবময় দৃষ্টান্ত, সেইরূপ আবার দরদী-সমর্থকরা, যাঁরা মাস্টারদার গোপন আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করেছেন, নিরাপদে তাঁর যাতায়াতের সময় তাঁকে সাহায্য করেছেন, পঁচিশ হাজার টাকার পুরস্কারের লোভ বিসর্জন দিয়ে, অজস্র নির্যাতনের বোঝা মাথায় বহন করেও বিনিদ্র প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা যেহেতু মেশিনগানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নজির রাখার সুযোগ পান নি, তাই বিপ্লবের পথে ও সংকট মুহূর্তে তাঁদের সেইসব অপরিহার্য কাজের মূল্য বালক টেগরার আত্মদান থেকে কি কোনো অংশে কম বলে ধরা যায়? এও বুঝতে হবে, টেগরা যত বেশী সাহসী ও যুদ্ধ দক্ষতায় পারদর্শী হোক না কেন, তবু মাস্টারদাকে গোপন আশ্রয় দেওয়া ও বে-আইনী অস্ত্র প্রভৃতি নিরাপদে রাখার দক্ষতা ও উপযুক্ততা তার ততখানি থাকা সম্ভব ছিল না এইরূপ বিশ্লেষণী মন নিয়ে আমাদের বুঝতে হবে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে—কত মা-বাবা, ছোট ভাইবোন,

আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, কত দরদী বন্ধু, কত হিন্দু-মুসলমান, কত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, এমন কি বালক-বালিকারা কতভাবে তাদের বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, ত্যাগের প্রেরণা ও বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে বিপ্লবী সৈনিকদের নানাভাবে সাহায্য করেছে; বিপ্লবীদের পুলিশের আক্রমণ থেকে কত সংকট মুহূর্তে বাঁচিয়েছে, বাঙলাদেশের সেইরূপ অখ্যাত অনামী নীরব কর্মীর বহু অবদান ও তাদের অনেক অদ্ভুত ও বিচিত্র ঘটনা আছে যার মূল্য মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটুও কম নয়—আর সেইসব ঘটনা দরদী সমর্থকদের স্বদেশপ্রেমের তথ্য যদি স্বাধীনতার ইতিহাসে উপেক্ষিত হয়, তবে ভারতীয় জনগণের মহান ঐতিহ্যপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে, ১লা জুলাই, ১৯৬৮ সালে আমার লেখা "চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ—প্রথম খণ্ড" বইতে লিখেছিলাম:

"ছোট মেয়ের কচি কণ্ঠে যখন অকস্মাৎ ধ্বনিত হল, 'কেন ওকে বিরক্ত করছিস—তোদের একটুও দয়ামায়া নেই?' —আমি ক্ষণিকের জন্য অভিভূত হলাম। কে এই বালিকা?……

ব্যাপারটা এক মধুর স্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছিল। সুশ্রী, সুন্দর, অপরূপ সেই করুণাময়ী মূর্তি! উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, চোখমুখ যেন তুলিতে আঁকা। অতি সাধারণ একটা শাড়ি পরা—কোথাও কোনো বাহুল্য নেই। করুণাঘন দৃষ্টি—বেদনা, দয়া ও সহানুভূতির সে যেন এক জীবন্ত প্রতিমা!"

বিশেষ এক পরিস্থিতিতে আমার সঙ্গে মাত্র পনেরো মিনিটের জন্য 'সেই মেয়েটি'র সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই ক্ষণিক সাক্ষাতের পরই সব হারিয়ে গেল, যেমন ঘনঘোর অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যায় না। কেবলই চারিদিকে অন্ধকার আর অন্ধকার! সেই নিবিড় অন্ধকারে আকাশের বুক চিরে একটি মাত্র বিদ্যুচ্ছটা দেখা দিল! আবার আকাশের বুকেই যেমন সেই বিদ্যুৎ-ঝলক মিলিয়ে যায়, তেমনি সেই বালিকাও কোথায় হারিয়ে গেল। আমিও কোথায় দূরে চলে

গেলাম। বহু বছর আমি তার সন্ধান পাই নি। এই সাক্ষাতের ছত্রিশ বছর পরে সেই বইতে আরও লিখেছিলাম: "......সামান্য ঘটনার এই ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকু অনন্ত বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায় নি...... যদি একবার এই লেখাটি তিনি পড়েন তবে আমার খুব ভালো লাগবে। আরও ভালো লাগবে যদি আজকের এই বাংলা লেখাটি কোনো সময়ে কোনো কারণে একবার পড়ে তিনি ছত্রিশ বছর আগের সেইদিনের সেই সামান্য ঘটনাটি মনে করতে পারেন।......ভারতের স্নেহময়ী নারীর প্রতিমূর্তি সেই শ্রদ্ধেয়া বালিকাটির কাছে আজ আমার আবেদন যদি কোনোদিন আমার এই লেখাটি পড়ে এই সামান্য ঘটনার স্মৃতি তাঁর মনে জাগে তবে কোনো আপত্তি না থাকলে একটি চিঠি লিখলে খুশী হব।......"

আরও আট বছর কেটে গেল। কখনও কি ভেবেছি পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বের সেই একটি বিদ্যুৎ-ঝলক, যা এই বিরাট বিস্তৃত আকাশের বুকে তখনই লুকিয়ে গেল, তা কি আবার দেখা দেবে? লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তড়িচ্ছটার মধ্যে সেই হারানো ঝল্‌কটিকে কি খুঁজে পাওয়া যায়?

ইতিহাসের কি এক বিচিত্র গতি! বৈচিত্র্যের মধ্যেও নতুনত্বের প্রকাশ! নিবিড় অন্ধকারের বুকে মিলিয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ-চমক আবার অর্ধ-শতাব্দী পরে নিজ-পরিচয়ে আর একবার চম্‌কাল। যা প্রায় অতীতের গর্ভে চির-বিদায় নিয়েছিল, তা আজ গাঢ় মেঘের আবরণ উন্মোচন ক'রে আবার উদয় হল স্ব-রূপে। এই অবিশ্বাস্য ও অদ্ভুত ঘটনার ছায়াপটে—'আমি সেই মেয়ে' আমারই জীবনের একটি ঐতিহাসিক বাস্তব কাহিনী।

"কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে কেন বসে চেয়ে রও ?
কথা কও, কথা কও।"

"একটু মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেলাম—একটি ছোট মেয়ে, বয়স নয়-দশ বছর হবে, ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। সে ভিড় ঠেলে খুব সহানুভূতির সঙ্গে ইঙ্গিতে আমাকে বসতে বললো। তারপর বালক সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে আদেশের সুরে বলে উঠল—'তোরা ওকে বিরক্ত করবি না, ওর ক্ষিদে পেয়েছে, আমি ওর জন্যে ভাত নিয়ে আসি।' এই বলে মেয়েটি দ্রুতগতিতে বাড়ির ভেতর চলে গেল।"

আজ কতদিনের কথা। ১৯৬৮ সালের ১লা জুলাই আমার লেখা 'চট্টগ্রামের যুববিদ্রোহ'-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডে আমি আমার মাত্র কয়েক মুহূর্তের একটি মধুর ও মহামূল্যবান স্মৃতির কথা লিখেছিলাম, আর প্রধান একটি উদ্দেশ্য নিয়েই সেটা লিখেছিলাম। সেইদিন, সেই ছোট মেয়েটি, আমার অন্তর আকর্ষণ করেছিল, আটত্রিশ বছর পরেও যখন ঐ মুহূর্তটির কথা উল্লেখ করতে গিয়েছি, তখনও বুঝেছি সেই অপূর্ব ছবিটি আমার হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন ক'রে আছে।

সেদিনের সেই লেখাটি বইয়ের পাতা থেকে আজ এখানে আবার পরিবেশন করতে ইচ্ছে করছে। সেদিন লিখেছি :

"ব্যাপারটা এক মধুর স্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছিল। সুশ্রী, সুন্দর অপরূপ সেই করুণাময়ী মূর্তি। উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, মুখচোখ যেন তুলিতে আঁকা। অতি সাধারণ একটা শাড়ি পরা—কোথাও কোনো বাহুল্য নেই। করুণাঘন দৃষ্টি—বেদনা, দয়া ও সহানুভূতির সে যেন এক জীবন্ত প্রতিমা !

"কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি ফিরে এল। কলাপাতায় সাজানো ভাত দু'হাতে ধরে নিয়ে এসেছে। অতিথিসেবার উপচার ছোট ছোট কচি দু'টি হাতে অপূর্ব শোভা বর্ধন করছে।......

"যে মেয়ের এতখানি দরদ, এত সহানুভূতি—যে আমার জন্য ভাত, ডাল, তরকারি সাজিয়ে নিয়ে এল, সে নিশ্চয়ই ঐ বড়োবাড়ির কেউ হবে। হয়ত সে কোনো সম্পদশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা, তবু তার বেশভূষায় ও শান্ত সংযত চলা-ফেরায় সম্পদ বা আভিজাত্য দম্ভের লেশমাত্র স্পর্শ নেই। তাই সে আরও সুন্দর—বাইরের চাকচিক্য বা বেশভূষায় নয়, অন্তরের সম্পদে ঐশ্বর্যময়ী ভারতমাতার এক অসামান্যা কন্যা সে।......

"খাওয়ার ভঙ্গিটা ইচ্ছে করেই পাগলের মতো করছিলাম—কখনও দু'হাতে খাচ্ছি, আর কখনও কোনটা খাব যেন বুঝতে পারছি না মতো ভান ক'রে চলেছি। সবটাই বালকদের কাছে আমোদের বিষয়—হাসি আর হাসি ; হাসতে হাসতে তারা একেবারে লুটোপুটি !

"এই আনন্দমুখর বালকদের দলে আগাগোড়াই সেই লক্ষ্মীপ্রতিমা বালিকাটি উপস্থিত ছিল। বালকদের কৌতুক উৎসবে মেয়েটির শান্তভাবের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম চোখে পড়ে নি। কিইবা তার বয়স—তবুও যে একটি মেয়ে—মায়ের জাত! এই বয়সেই দরদ দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে পরের দুঃখ ব্যথা উপলব্ধি করার শক্তি তার হয়েছে। আমি যতক্ষণ পাগলামির ভান ক'রে খাচ্ছিলাম, ততক্ষণ আমার দৃষ্টি অন্যের অগোচরে মেয়েটির প্রতি নিবদ্ধ ছিল। আমি তার প্রতিটি আচরণ নিরীক্ষণ করছিলাম।

সুলক্ষণা, অসামান্যা এই মেয়েটিকে ঋষি বঙ্কিমের কল্পনাসৃষ্ট ভবানী পাঠক যদি একবার দেখতে পেতেন, তবে কি তিনি এই বালিকাটিকেও দেবীচৌধুরাণীর আসনে বসাবার উপযোগী ক'রে তুলবার শিক্ষা দিতেন না ?

"আমার খাওয়া শেষ হল। নাটকের এই অঙ্কে শেষ যবনিকা

টেনে আমায় উঠতে হল। ক্ষণিকের অতিথি আমি, উদ্দেশ্য আমার সামান্যই—ক্ষুধার জ্বালা মেটাবার জন্য চেয়েছিলাম আহার্য। আহার্য পেয়েছি—পেট ভরে খেয়েছি, তবুও যাবার সময় মনের ওই প্রতিক্রিয়া কেন? বালিকাটির প্রতি আমার যেন কেমন মায়া জন্মেছে।

"আনন্দমঠে ভবানন্দ মহেন্দ্রকে বলেছেন—'আমাদের মা নেই, বাপ নেই, ঘর নেই, বাড়ি নেই, আমরা জানি জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। মহেন্দ্র অবাক হয়ে প্রশ্ন করল—'তোমাদের মায়া নেই?' তখন ভবানন্দ বলিলেন—'যে বলে মায়া নেই সে হয় মিথ্যা ভান করে নয়ত কোনদিনই তার মায়া ছিল না। আমাদের মায়া আছে তবে মায়া কাটাই।' তবে আমাকেও মায়া কাটাতে হবে। মায়ার বাঁধন আমাদের বেঁধে রাখতে পারে না। বালিকাটির মধুর ব্যবহার ও সহানুভূতি আমাকে আকর্ষণ করেছে। জীবনে এর পূর্বে আর কখনও কোনো ছোট ছেলে বা মেয়ে আমার হৃদয় এতখানি কি জয় করতে পেরেছিল? সেই অসহায় অবস্থায়, যখন একটু করুণা, একটুখানি দয়া ও সামান্য সহানুভূতির জন্য আমার প্রাণ উন্মুখ, তখন এই বালিকার হৃদয়ের প্রসারতা, মানুষের প্রতি দয়া, আমাকে অভিভূত করেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই অনামী অখ্যাত সামান্য ছোট্ট মেয়েটির কি স্থান থাকবে না?

"এখন আমায় যেতে হবে। যাওয়ার আগে সেই মেয়েটির কাছে বিদায় নেবার ইচ্ছে ছিল। এমন কি সম্ভব হলে, আমার পরিচয়টুকু দিতে পারলেও ভালো লাগতো। কিন্তু কিছুই না ব'লে চলে আসতে হল। না ব'লে চলে আসার বেদনা অনুভব করছিলাম। বালকদের দল দীঘির পাড় ধরে কিছুটা পথ আমাকে অনুসরণ ক'রে এল। আমি শেষবারের মতো ফিরে তাকালাম। মেয়েটি তখনও বালকদের সঙ্গে ছিল। আমি মেয়েটির ক্ষণিকের আতিথ্যের এই স্মৃতিটুকু নিয়েই বিদায় নিলাম।

"সামান্য ঘটনার এই ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকু আজও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে

যায় নি। অন্যের কাছে এই ক্ষণিকের ক্ষুদ্র ঘটনা যতই নগণ্য হোক না কেন, আমার কাছে এই ছোট্ট মেয়েটির ছোট্ট করুণার স্পর্শ অতীত স্মৃতির অনেকখানি জুড়ে আছে। পাঁচ বছর পূর্বে যখন 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' ইংরেজী দৈনিকে প্রতি সপ্তাহে লিখছিলাম, তখনও এই ঘটনার উল্লেখ করেছি। তখন আমার ইচ্ছে ছিল অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো সময়ে সেই বালিকাটি (আজ যায় বয়স পঁয়তাল্লিশ বা ছেচল্লিশের বেশী হবে না) যদি একবার এই লেখাটি পড়েন তবে আমার খুব ভালো লাগবে। আরও ভালো লাগবে যদি আজকের এই বাংলা লেখাটি কোনো সময়ে কোনো কারণে একবার পড়ে তিনি ছত্রিশ বছর আগেকার সেইদিনের সেই সামান্য ঘটনাটি মনে করতে পারেন।

"জানিনা আজ তিনি কোথায়। ফেণী-বিলোনিয়ার বড়ো রাস্তার কোনো এক জায়গায় তাঁদের বাড়ি। বাড়িতে মন্দির আছে। কম্পাউণ্ডটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাড়ির সামনে ডান পাশে বড়ো পুকুর বা দীঘি—দীঘিতে পাকা ঘাট। একদিন দুপুরবেলায় একজন অর্ধ-পাগল প্রায় নগ্ন অবস্থায় ক্ষুধার তাড়নায়, আহারের আশায় ঐ বাড়িতে গিয়েছিল। একটি নয়-দশ বছরের বালিকা অশান্ত ছেলেদের উৎপীড়নের হাত থেকে 'পাগলটিকে' বাঁচিয়ে সযত্নে খাবার এনে তাকে খাওয়ায়। ভারতের স্নেহময়ী নারীর প্রতিমূর্তি সেই শ্রদ্ধেয়া বালিকাটির প্রতি আজ আমার আবেদন, যদি কোনোদিন আমার এই লেখাটি পড়ে এই সামান্য ঘটনার স্মৃতি তাঁর মনে জাগে তবে কোনো আপত্তি না থাকলে একটি চিঠি লিখলে খুশী হব। ঠিকানা এই বইয়ের প্রেসেই পাওয়া যাবে। সকলকে জানাবার অভিপ্রায়েই যদিও আমার এই ঘটনাটি লেখা, তবু বিশেষ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়েছি লেখার জন্য—যদি লেখাটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর পাকিস্তানে থাকার সম্ভাবনাই বেশী; কারণ, তাঁদের বাড়িটি পূর্ব-পাকিস্তান এলাকায় পড়েছে। কাজেই আমার এই লেখাটি তাঁর হাতে কোনোদিন গিয়ে পৌঁছবার আশা খুবই কম।

"আজ আমার বয়স চৌষট্টি। আমার অবর্তমানে পুরনো কাগজের গাদা থেকে উদ্ধার পেয়েও এই লেখাটি কোনো একদিন যদি তাঁর হাতে গিয়ে পড়ে, সেদিন তিনি বুঝবেন বাংলার অগ্নিযুগের সৈনিকেরা কেবল ইংরেজের বিরুদ্ধেই রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, তাদের দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা, প্রভৃতি কিছুই ছিল না—তা নয়। তাদের অন্তরেও স্নেহ-মমতা, আবেগ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অনুভূতি কারো চেয়ে কম ছিল না!

"এই মধুর স্মৃতি আমার জীবনে একটি অপূর্ব সঞ্চয়! এই স্মৃতি ভোলা যায় না, আমি ভুলতে পারি নি। সেদিনের হে অনামী, অখ্যাত, সামান্যা বালিকা! তোমার মমতাপূর্ণ দরদী হৃদয়ের প্রতি সেই দিনই আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছি। আজ দীর্ঘ ছত্রিশ বছর পরেও আমার সেই শ্রদ্ধা অটুট আছে। যদি কোনো দিন এই সামান্য ঘটনা তোমার মনে পড়ে তবে জানবে, উন্মাদ বেশে যে ক্ষণিকের অতিথি তোমাদের বাড়ি গিয়েছিল সে আর কেউ নয়—ভারতের মুক্তি-যুদ্ধের একজন সৈনিক—অনন্ত সিংহ।"

এটা লেখার পরও একটা একটা ক'রে সাত সাতটা বছর অতিবাহিত হল। জীবন নদীতে বিরামহীন—বিশ্রামহীন চিরচঞ্চল ও ভ্রূক্ষেপহীনভাবে কালের স্রোত চলেছে তো চলেছে—কেবলি বয়ে চলেছে। কখনও তরঙ্গ তুলে, দু' কূল ভাসিয়ে সব নিশ্চিহ্ন ক'রে বয়ে গেছে। আবার কখনও বা সেই স্রোত মরুপথে হারিয়েছে ধারা। বিরাট নিশ্চিহ্নতার মধ্যে আমি সেই চিহ্নটি কি আর খুঁজে পাব? যে নদী মরুপথে হারালো ধারা তা কি খুঁজে পাওয়া যায়? কবির কথা কি সত্যি?—

"যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।"

সত্যিই কি সে ধারা হারিয়ে যায় নি? কে জানে?

আমার বয়স এখন বাহাত্তর বছর। বয়স কি মনোবাঞ্ছা পূরণের অপেক্ষা রাখে? বিফল সে প্রতীক্ষা! সূর্য যখন

একেবারে অস্তাচলের মুখে, যখন সব আশাই প্রায় শেষ হতে চলেছে, তখন কে আবার বাজালো বাঁশি এ ভাঙা-হৃদি-কুঞ্জবনে ? একি এক অপূর্ব সম্পদ—এ যে এক মনোহর স্বপ্ন। অপ্রত্যাশিতভাবে মরুর ঘূর্ণিবায়ু সেই হারানো নদীর প্রতিটি জলকণাকেই আজ আমার হাতে ফিরিয়ে দিল। একটি বহু আকাঙ্ক্ষিত, বহু-প্রতীক্ষিত পোস্টকার্ড—যার প্রতিটি শব্দই আমাকে নিয়ে গেল আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার সেই বিলোনিয়া গ্রামে,—নিয়ে গেল গ্রামের সেই প্রকাণ্ড বাড়িতে—সেই বাড়িরই সেই ছোট্ট দেবী-প্রতিমার করুণাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে। আমি যেন চিন্তায় একেবারে ডুবে গেলাম—হারিয়ে গেলাম মনের গভীরে।

"জীবনে আজও যাহা রয়েছে পিছে,
জানি হে, জানি তাও হয় নি মিছে

॥ ২ ॥

আজ ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫ সাল। আজ সকালে আমি একটি পোস্টকার্ড পেলাম। একি! কার এই পোস্টকার্ড! আমি একেবারে চম্‌কে গেলাম। মৌর্যবংশের রাজা চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী চাণক্যও কি একটি বালিকার কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত শুনে এমনিভাবে বিস্ময়ে চম্‌কে উঠেছিলেন? চাণক্য কি সেই সঙ্গীতের মধুর সুরে আকৃষ্ট হয়ে ভিক্ষুকের সঙ্গে তার হারানো কন্যা আত্রীর সন্ধান পান! এই পোস্ট-কার্ডের লেখা কথা বলতে পারছিল না বটে, কিন্তু মনে হচ্ছিল সঙ্গীতের মধুর সুরে তা যেন নিজের পরিচয় দিচ্ছে—আমিই তোমার হারানো সেই ছোট্ট বোনটি। আমি যেন চাণক্যের মতো আত্রীকে পেলাম—পেলাম আমার হারানো বোন শ্রীমতী ঊষাকে!

এই পোস্টকার্ড আমার কাছে মহামূল্য সম্পদের একটি দলিল। এইটি যে সেই হাতেরই লেখা—যে কচি হাতে আজ থেকে চার যুগ আগে আমার ক্ষুধা নিবারণের জন্য ভোজ্য সামগ্রী সাজিয়ে এনেছিল। এই চিঠির প্রতিটি অক্ষর আমার চোখের সামনে যেন শত শত হীরের কুচি ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আনন্দে আমি প্রায় আত্মহারা হয়ে পড়ি। আমি কিছুক্ষণের জন্য ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করবো! আনন্দে হাসব না কাঁদব। ইচ্ছা করছিল প্রাণ খুলে হাসি! এই বিপুল আনন্দের মধ্যেও আমার কাঁদতে ইচ্ছে করাছল! ইচ্ছে করছিল ছুটে গিয়ে সবাইকে চিৎকার ক'রে বলি—এস! তোমরা একবার এসে দেখে যাও আমার করুণাময়ী লক্ষ্মীপ্রতিমার সন্ধান আমি পেয়েছি। পঁয়তাল্লিশ বছর পরে ঘন-অন্ধকারের আবরণ উন্মোচন ক'রে হয়েছে তার আবির্ভাব! সে

লিখেছে—"আমি সেই মেয়ে!" সে আরও লিখেছে—"আমি আপনার ছোট বোন।" সত্যই সে আমার একটি ছোট বোন, আর আমি তার দাদা। এই অপূর্ব বন্ধন—এই সুগভীর সম্পর্কের শুভ-সূচনা ঘটেছিল আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে শুধুমাত্র মুহূর্তের নির্বাক সাক্ষাতে। মানব চক্ষুর দৃষ্টির অগোচরে অদৃশ্য স্নেহ-মমতার সূত্রে আমাদের বেঁধে ফেলেছে এক সুনিবিড় প্রাণের বন্ধনে। ছোট বোনটি আমার—তুমি আমাকে চিঠি লিখেছ! তোমার সন্ধান তুমি আমাকে দিয়েছ!

অমূল্য সম্পদ এই পোস্টকার্ডটি—কি এক অতুল ঐশ্বর্যময় এই একটি দলিল! দলিলটি হস্তান্তর করা কোনো প্রকারে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি সেইটি অতি সযত্নে ও সংগোপনে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার কাছে রেখে দেবো। পারি যদি তবে সবার অবগতির জন্য চিঠিটির একটি ফটোস্ট্যাট কপি ক'রে বইয়ের পাতায় জুড়ে দেবো। আপাতত একটি দায়িত্ব পালন করার বাসনায় আমি নিচে সেই পোস্টকার্ডের কথা কটি হুবহু তুলে দিচ্ছি :

"ওঁ রাম

"নিমতা
কামিনী কুঞ্জ

কলিকাতা-৪৯

"পরমপূজনীয়,

দাদা, কয়েক বৎসর পূর্বে আমার এক বোনের ছেলে আপনার লেখা একখানা বই পড়ে এসে আমাকে বলে তাহাতে লেখা ছিল আপনি লিখেছেন, স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন আপনি আত্ম-গোপন ক'রে চট্টগ্রাম থেকে বিলোনিয়া যাচ্ছিলেন, তখন ফেণীর নিকট বারাহিপুর গ্রামে আপনার পরিচয় হয় একটি দশ বছরের মেয়ের

সঙ্গে। সে আপনাকে কি খেতে দিয়েছিল তা অবশ্য আজ মনে নেই। আমি সেই মেয়ে। বইতে লেখা ছিল তাহাকে আপনার সাথে দেখা করিতে, কিন্তু যখন এই খবর পাই সেই সময় আপনি আবার এই স্বাধীন দেশেও বন্দী। ইহাকে বলে অদৃষ্ট। দেশ স্বাধীন হল, কিন্তু আমরা কি পেলাম ? বাড়ি নেই, ঘর নেই সর্বহারা হয়ে কোনো প্রকারে বেঁচে আছি। যাক, এই পত্র আপনার হাতে পৌঁছাবে কিনা জানি না। তবুও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে লিখিতেছি। যদি আপনার হাতে যায় তবুও উত্তর পাব কিনা তাহাও জানি না, যদি পাই নিজের সৌভাগ্য মনে করিব। আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আছে। তাহাও কি সম্ভব হবে ? সবই ৺ভগবানের ইচ্ছা, নতুবা যে দেশের স্বাধীনতার জন্য এত কষ্ট করলেন সেই দেশেও আবার কারাগারে বন্ধ হয়ে আছেন এসব কথা ভাবতেও পারি না। লিখবার বা বলবার মতো ভাষাও আমার নেই তবু আপনার সব জানতে আমার সব বলতে ইচ্ছা করে। সুযোগ হবে কিনা ৺ঠাকুরই জানেন। আর বিশেষ কি। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই উত্তর দিবেন। আমি আপনার সাথে দেখা করিব। আপনাকে আমার মনে নেই। আমাকেও আপনি দেখিলে চিনিবেন না। তবুও দেখিতে ইচ্ছা করে। হবে কিনা জানি না। আর বিশেষ কি। আপনার শরীর কেমন আছে ? আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আপনার মঙ্গল কামনা করি। অনেক ভয়ে ভয়ে পত্রখানা লিখিতেছি।

"ইতি—
সেবিকা
আপনার ছোট বোন
ঊষারাণী নন্দী

এই পোস্টকার্ডটি আমি বার বার পড়েছি, আর যতবারই পড়েছি ততবারই আমার অন্তর আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছে। এই তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে আমার জীবনে যে নাটকের শুভ-সূচনা হয়েছিল ভেবেছিলাম বোধ হয় তার যবনিকাপাত হয়েছে অনেক আগেই। কিন্তু ছোট বোনের চিঠিটি আমার জীবন-নাট্যের দ্বিতীয় অঙ্কের আবরণ উন্মোচন করল। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মরুর ঘূর্ণি বায়ুতে উড়ে আসা সেই পোস্টকার্ডটি। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে, সেই চিঠির আমার দেওয়া সুদীর্ঘ উত্তর। এই চিঠির উত্তর কি আমি না দিয়ে থাকতে পারি? ১৪ই ফেব্রুয়ারী চিঠি পেয়েছি। জেলের নিয়মকানুন অনুসরণ ক'রে লিখতে বসেছি ১৬ তারিখে। শ্রীপঞ্চমীর অঞ্জলি-দেওয়া শেষ হয়েছে সকালে। যে পেরেছে বা যারা ইচ্ছে করেছে, তারাই ভক্তিভরে অঞ্জলি দিয়েছে। বাণী বন্দনায় তারা দিন কাটিয়েছে। জেলের একটি রুদ্ধ কক্ষের মধ্যে রাত্রে বন্দী আমি চিঠি লিখতে শুরু করলাম সেই ছোট্ট বোনটিকে।

আমার সুদীর্ঘ চিঠির সবটি উদ্ধৃত ক'রে পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। কেবলমাত্র চিঠিটির বিশেষ অংশ নিচে তুলে দিলাম এইভাবেই চিঠিটি শুরু করেছিলাম—

"স্নেহের ছোট বোনটি,

ছোট একটি পোস্টকার্ড প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বের এক অপূর্ব স্মৃতি অতি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে আমার কাছে বহন ক'রে এনেছে। কত যে ভালো লাগলো, এতে যে কতখানি আনন্দ, কত-খানি সুখ ও মনের পরিতৃপ্তি রয়েছে, তার পরিধির উপলব্ধি ভাবপ্রবণ মনের অনুভূতি ছাড়া কি সম্ভব?"

এইভাবে শুরু করার পর আমি তাকে লিখেছি, কিভাবে আমি জনৈক পাগলের বেশে তাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলাম, আর সে সমস্ত দুরন্ত বালকদের শাসন ক'রে তাদের দৌরাত্ম্যপনার হাত থেকে

আমায় উদ্ধার ক'রে আমার প্রতি পরম দয়াপরবশ হয়ে আমায় খেতে দিয়েছিল—তার বিবরণ। আমি না হয় আমার সেই নিদারুণ দুরবস্থার মধ্যে তার সেই সময়কার কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু সেইদিন আমার মতো একজন 'অভুক্ত-পাগল-ভিখারী'কে খেতে দেওয়া তার কাছে দৈনন্দিন কাজের মধ্যে একটি তুচ্ছ ঘটনা মাত্র। তাই তাকে চিঠিতে লিখলাম :

"আমার জীবনে এই মুহূর্তের ঘটনাটি ক্ষুদ্র ব'লে কখনও মনে হয় নি, আমার কাছে এটি খুব বড়ো, যে পরিস্থিতিতে, আমি তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম এবং তোমার অন্তরের করুণার নিদর্শন পেয়েছিলাম, তা হয়ত আমার পক্ষে কোনো মতেই ভোলা সম্ভব নয়। কিন্তু ঐ একটি ক্ষুধার্ত পাগল ও অসহায়কে তুমি কয়েক মুষ্টি অন্ন দিয়েছ—সেইরূপ সামান্য ঘটনা তো তোমার জীবনে অনেকই আছে। সেই সব কি কারো মনে থাকে? আর তোমার বোনের ছেলে আমার বই পড়ে এই ঘটনাটির 'সেই নাবালিকা নায়িকা' যে তুমি, সেটা বুঝল কি ভাবে? আমি তোমাদের গ্রামের নাম জানতাম না। অনেক গ্রামই আমি অতিক্রম করেছি। কোনো গ্রামের নাম জানা আমার সম্ভব ছিল না, তাই আমার বইতে কোনো গ্রামের নামের উল্লেখ নেই। আমি বাড়ির সঠিক অবস্থানটি বোঝাবার জন্য সংলগ্ন পুকুরের, বাড়ির সম্মুখের রাস্তাটি এবং ফেণী-বিলোনিয়ার নতুন রেললাইনের উল্লেখ করেছিলাম এবং প্রতিটি অবস্থানের বিষয় বর্ণনা দিয়েছি। সেই বিবরণ পড়ে সেই বাড়িটি যে তোমাদেরই তা হয়ত অনুমান করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তোমার বোন তো জানতেন না, তোমার এই এক অনাহূত অভুক্ত 'পাগল অতিথি' সেবার কথা? তোমাদের মধ্যে কি আমার এই বইয়ের ঘটনাটি পড়ার আগে, সেই 'পাগল'কে নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছিল? সেইরূপ আলোচনার কোনো বিশেষ কারণ তো থাকতে পারে না, যেহেতু এতে কোনো বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কিছুই ছিল না। তোমার বোনের ছেলে বইতে

এই বাড়ির বর্ণনা পড়ে কি করে বুঝেছিল—সেটি তোমাদেরই বাড়ি ? সে কি তার মা ও তোমাকে প্রশ্ন করে জেনেছে যে এইরূপ একটি পাগল তোমাদের বাড়ি একদিন গিয়েছিল আর তুমিই 'সেই মেয়ে' যে সেই অভুক্ত অনাহারক্লিষ্ট পাগলকে খেতে দিয়েছিল ?

"তোমার চিঠি পড়ে মাত্র এইটুকুই জানলাম তোমার "এক বোনের ছেলে" অর্থাৎ তোমার অন্তত আরও একটি বোন আছে। আর জানলাম তোমার মর্মবেদনা ও গভীর ক্ষোভের কথা— "……আমরা কি পেলাম, বাড়ি নাই ঘর নাই সর্বহারা হয়ে কোনো প্রকারে বেঁচে আছি।" তোমার সম্বন্ধে বর্তমানে এইটুকু জানতে পারলাম। তোমার সংবাদ কোনো দিন পাব কিনা তা জানতাম না। তবুও কোনো এক সুদিনের প্রতীক্ষার আশায় এই বইতে লিখেছি। ইতিপূর্বে ১৯৫৫ সালে দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা 'হিন্দুস্থান-স্ট্যাণ্ডার্ডে'-এ আমি এক বছর লিখেছি। সেখানেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। এই পত্রিকা শিল্পীর হাতে আঁকা বহু ছবি দিয়ে ঘটনাগুলোকে আরও সুন্দর ক'রে পরিবেশন করেছিল। তোমার চিঠিটি পেয়ে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর সেই সব কাগজগুলো উল্টে পাল্টে দেখছিলাম—শিল্পীর আঁকা 'সেই মেয়েটি' 'পাগল অতিথি'কে দূর থেকে খাবার পরিবেশন করছে আর বালকের দল মেয়েটিকে ঘিরে আছে।

"আজকে আমার যে কতখানি আনন্দ বুঝতে হলে তা কবির কল্পনায় বুঝতে হবে, স্বপ্ন দিয়েই সেই মধুর স্মৃতির মন্দির সৃষ্টি করা যায়, শিল্পী মন নিয়েই শিশুপ্রাণের করুণামাখা সেই বালিকার মহত্ত্বের কথা নিভৃত অন্তরের বীণার ঝংকারের মধ্যে উপলব্ধি করা হয়ত যায়। পূর্ব-পাকিস্তানের সেই সর্বনাশা দিনগুলি—যখন নৃশংস গণহত্যা ও ধ্বংসলীলার তাণ্ডব চলেছে, তখন কয়েকবার মনে হয়েছে —তুমি কোথায় ? তোমরা তখন কোথায় ? দেশ বিভক্তির সময় তোমরা বা তুমি কি পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলে ? এমনি কত কি

ভেবেছিলাম। এইসব চিন্তা মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে—পাকিস্তানী শাসকদের ধ্বংসলীলার মধ্যেও কি তোমরা পরিত্রাণ পেয়েছ? দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। চিন্তার সমাধি চিন্তাতেই হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ও মানসচিত্রপটের পাতায় যদি এই স্মৃতিটুকু মলিন হয়ে বিস্মৃতির কোলে চিরকালের মতো বিদায় নিত, তবে তা আমার জীবনে এক মহাশূন্যতায় পরিণত হ'ত, নিজের প্রতি আমার ধিক্কারের অন্ত থাকত না।"

আবেগভরে এইসব লিখেছি। তারপরেও অনেক মনের কথা জানালাম—সবটাই আমার ভাবপ্রবণতার অভিব্যক্তি। শেষে এই ক'টি লাইন যোগ দিলাম :

"······সেই তুমি—প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের তুমি—তোমারই হাতের লেখা চিঠি, যে নাবালিকা হস্তে তুমি তোমার অজান্তেই সেইদিন এক অজ্ঞাত অপরিচিত দাদাকে তার ক্ষুধা নিবারণের জন্য অন্নদান করেছিলে—আজ সেই দাদারই তুমি ফিরে পাওয়া ছোট্ট বোন! যে জীবন-নাট্যের যবনিকাপাত হয়েছিল ব'লে মনে হয়েছে, তা এখনও শেষ হয় নি—আবার যে দ্বিতীয় অঙ্কের এই আরম্ভ হবে তা কে জানত।"

ঊষা তার চিঠিতে আমার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে, তাই তাকে আরও লিখেছি :

"তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে? সত্যই আসবে? অনেক দূরের পথ। আসা যাওয়া খুবই কষ্টকর হবে। তবুও তুমি আসবে? যদি আস, তবে আমার খুবই ভালো লাগবে। তোমার শরীর যদি ভালো থাকে, তুমি যদি সম্পূর্ণ সুস্থ আছো মনে করো, আর যদি তোমার খুব অসুবিধা না থাকে তবে এস—আমার জীবনে তোমার সঙ্গে অভাবনীয় জেল-সাক্ষাৎ আর একটি ঘটনা হয়ে থাকবে।"

এইটুকু লেখার পর আমি তাকে বিস্তারিতভাবে লিখে জানালাম কি ভাবে ও কখন সে আসতে পারে। আর ঊষা কবে আসছে তা

জানিয়ে যদি চিঠি দেয় ও সেই চিঠি আমার হাতে যথাসময়ে এসে পৌঁছায়, তবে তার আসার দিন সাক্ষাতের সময় কিছু আগে থেকেই জেল অফিসে আমি উপস্থিত থাকব। এছাড়া আমার Constituent Attorney, আমার এক ভাই—সমীরকেও উষাকে সবিস্তারে চিঠি দেবার কথা বলেছিলাম। সেটিও উষাকে জানালাম এবং সমীরের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে সে যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে তাও লিখলাম। সর্বশেষ চিঠির পরিসমাপ্তিটি এইভাবে করলাম :

"চিঠি খুব বড়ো হয়ে গেল। আজ আর না। তোমাদের মঙ্গল কামনা করি। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশিস নিও।

ইতি—

তোমার দাদা"

কোনো মতে চিঠিটি শেষ করলাম। যাঁরা আমাকে জানেন তাঁদের কাছে উষাকে আমার এমনিভাবে "তুমি সম্বোধন" ও তার নাম ধরে তাকে অভিভাষণ আমার স্বভাববিরুদ্ধ বলেই মনে হবে। উষা তো নিজেই আমাকে লিখেছে—সে আমার ছোট বোন। হোক না কেন সে ছোট, তবু সে বলেছে বলেই কি আমার নিজেকে এমনি-ভাবে দাদার উচ্চাসনে বসাতে হবে? সে তো আজ আর ছোট্ট মেয়েটি নয়, বয়সে সে নিশ্চয়ই আমার থেকে অনেক ছোট তবু এখন তার বয়স পঞ্চাশ বছর তো হবেই। কে উষার স্বামী এবং বর্তমানে তার স্বামী ও তার সঠিক পদমর্যাদা তো আমার জানা নেই। আমার এরূপ অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সে নিজেকে ছোট বোন বলেছে বলেই কি সেই সুযোগ নিয়ে বড়ো ভাইয়ের অধিকার জাহির করা সমীচীন হবে? এই ধরনের সব কথাই আমার মনে উঠেছে এবং উষারাণীকে সম্ভ্রম-সূচক সম্বোধন করাই উচিত ব'লে একবার আমার মনেও হয়েছিল। কিন্তু সম্মান দেখাতে গিয়ে যদি উষার অন্তরের যথার্থ অনুভূতিটি না বুঝে তাকে আমার সেইরূপ কোনো সম্মান প্রদর্শন হয়ে ওঠে তার

প্রতি অমর্যাদা—তার সরল অন্তরের প্রতি হয়ে পড়ে অশ্রদ্ধা প্রকাশ, তবে সেটি যে হবে আমার একটি অমার্জনীয় অপরাধ। তাই উত্তর লেখার আগে পোস্টকার্ডটি বহুবার নিবিষ্ট মনে পড়েছি এবং তার লেখার মধ্যে সরলতার যে সুর ও সঙ্গীতের হৃদয়স্পর্শী তান-লয় মিশ্রিতভাব ও নীরব মধুর ধ্বনির প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, তার প্রতি স্বাভাবিক স্বীকৃতি না দিয়ে আমি আর পারলাম না—ছোট বোনের প্রকৃত আসনে বসিয়ে, বোনের মর্যাদা দিয়েই চিঠি যে ভাবে লেখা উচিত সেভাবেই লিখেছি।

বোনটিকে আসতে লিখলাম। হারানো সেই ছোট্ট বোনটির সংবাদ আমাকে নিশ্চয়ই অস্থির ক'রে তুলেছিল। আমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল—ভাবছিলাম কবে সে আসবে, কখন তার দেখা পাব, আরও ভেবেছি কতদিন অপেক্ষা করতে হবে? সকালবেলায় চিঠিটি ভাঁজ ক'রে জেলের "হিস্ট্রি টিকিট" —যাতে আমার প্রত্যেকটি বিষয় নোট করা হয় তা অফিসে পাঠিয়ে দিলাম যেন সেইদিনই ডাকে যায়।

প্রতীক্ষায় রইলাম—আকুল সে প্রতীক্ষা! একটি ক'রে দিন যাচ্ছিল আর নানা কথাই ভাবছিলাম: আমার চিঠি পেলো কিনা, চিঠি পড়ে কি তার মানসিক প্রতিক্রিয়া? এবং আমি আমার **Constituent Attorney**—সমীরকে যে চিঠি লিখতে বলেছি, সেই চিঠি সে পেল কিনা? জেলে আমার সঙ্গে দেখা করার পদ্ধতি কি এবং কখন কিভাবে আসতে হবে তাও লিখে দিয়েছি। সে কবে আসবে সেই দিনক্ষণ ঠিক ক'রে আমাকে অথবা সমীরকে জানিয়ে দেবে তো? কবে তার আসার দিন, তা জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম।

দিন কেটে যাচ্ছে। এ আর ক'টা দিন। ১৭ তারিখে আমার চিঠিটি ডাকে যেন যায় সেজন্য তাড়াহুড়া ক'রে খুব সকালেই জেল অফিসে পাঠিয়েছি। তারপর ডাকের কৃপার ওপর নির্ভর করা ছাড়া তো উপায় নেই। কিন্তু ডাকের ব্যাপার দেবা ন জানন্তি! কবে

চিঠি গিয়ে পৌঁছাবে—আর আদৌ পৌঁছাবে কিনা কে জানে! আশা নিরাশায় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আমার মন দোল খাচ্ছে। এইরূপ চিঠি বিভ্রাটের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে ভেবে আমার খুবই খারাপ লাগছিল। কয়েকবার নিজেকে নিজেই তিরস্কারও করেছি। এত অস্থির হবার কি আছে, যদি এই চিঠি শ্রীমতী উষার কাছে নাও পৌঁছায়, তবে না হয় আর একটা লেখা যাবে। যদি পঁয়তাল্লিশ বছর একটি আবছা মধুর স্মৃতি, যা ক্রমে ক্রমে ম্লান থেকে ম্লানতর হচ্ছিল, এবং সেই ম্লান স্মৃতির একটিমাত্র কণা নিয়েই যদি আমার এতদিন কাটানো সম্ভব হয়ে থাকে, তবে আজ কেন সামান্য কারণে এত অস্থিরতা—কেন আমার হৃদয়াবেগের রুদ্ধদ্বার এমানভাবে উন্মুক্ত হওয়ার জন্য একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে? সংবাদ পেয়েছি: সেই নাবালিকা মেয়েটি বেচে আছে, এবং সে লিখেছে—"আমি সেই মেয়ে", সে আরও লিখেছে—"আমি আপনার ছোট বোন।" যে ছিল এতদিন হারিয়ে যাওয়া আমার একটি নাবালিকা বোন—যার আর কোনো পরিচয় এই সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর আমি জানতাম না, সেই তো সেদিন আমাকে জানাল, সে বেঁচে আছে—সেই আমার হারানো "সেই মেয়ে"—সেই আমার বোনটি। এই অভাবনীয় নীরব জীবন-নাট্যের আসন্ন যবানকার পূর্বে এ আবার নব কাহিনার সূচনা! এরূপ নাটকীয় মুহূর্তে যদি আমার মন উদ্বেল হয়ে ওঠে তবে সে অস্থিরতাকে মানবজীবনের খুব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলেই মেনে নেওয়া কি উচিত নয়?

বিগত পাঁচ বছরের অধিক আমি জেলে আবদ্ধ আছি। আমার বয়স আজ বাহাত্তর। আমার হৃদযন্ত্র এখনও সক্রিয় আছে একটি বিদ্যুৎচালিত "পেস-মেকার" যন্ত্রের সাহায্যে, যা একবছর আগে আমার বুকের পাশে শরীরের মধ্যে বসানো হয়েছে। কখন যে হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হবে, সেই মুহূর্তটি কখন যে আসবে, তার জন্য ভাবার কিছু নেই বটে, তবে সাধারণতঃ আমার বয়সের লোকদের হৃদরোগের মৃত্যু-কৃপা

যত সহজে ও অকস্মাৎ হতে পারে তা একজন অল্প বয়স্ক সবল ও সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে ঘটার সম্ভাবনা কম, তাই আমার জীবনের অনিশ্চয়তার কারণবশতঃই আমি বোধ হয় আরও বেশী অস্থির হয়েছি। যখন মরণের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ ক'রে এখনও বেঁচে আছি এবং এই সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর পরে যদিও বা হারানো সুরটি খুঁজে পেয়েছি—পেয়েছি হারানো বোনটির সন্ধান, তবে আর একটি দিনেরই বা দেরি কেন?—মুহূর্তের জন্য কালবিলম্ব না ক'রে বোনটির সঙ্গে দেখা হবে না কেন? সে যদি সময়মতো চিঠি পায় ও ইচ্ছা করে তবে তো খুব তাড়াতাড়িই দেখা হওয়া সম্ভব। তাই আমি অস্থির, তাই চাইছিলাম একটি উত্তর—জানতে চাইছিলাম স্নেহের ঊষা কবে আসছে।

আমার চিঠি যদি জেল-কর্মচারী ডাকে পাঠিয়ে থাকেন তবে সে তো ১৭ তারিখে পোস্ট করা হয়েছে। আজ মাত্র ২১ তারিখ। আমার চিঠি যদি ঠিক সময়েও গিয়ে থাকে তবু কি আজকে জেলে বসে আমি চিঠির উত্তর আশা করতে পারি? কি আশ্চর্য! ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক মন তবু একটি চিঠির প্রতীক্ষা ক'রে আছে। হিসেব ক'রে দেখলে কোনো মতেই এর মধ্যে ডাক মারফত চিঠির উত্তর পাওয়া তো সম্ভব নয়। তবুও অশান্ত মন মানে না মানা।

আজ ২১শে ফেব্রুয়ারী। জেলে আমার বন্ধুরা আমার মামলা সম্বন্ধে বিশেষ পরামর্শের জন্য আসবেন। সময় ধার্য করা ছিল যেন তারা বিকেল চারটার সময় উপস্থিত হন। আমি ঠিক সময়ে জেল-অফিসে উপস্থিত হয়েছি। প্রথমেই দেখলাম বন্ধুবর শ্রীমিহির বোস অগ্নিযুগের আমার এক সাথী, এসে হাজির। আমার এক প্রিয় সাথী চট্টগ্রাম বিপ্লব তীর্থের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীঅর্দ্ধেন্দু গুহরও আসার কথা ছিল কিন্তু তিনি এলেন না। তার পরিবর্তে সেই সংস্থারই আর একজন যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীবনবিহারী দত্ত এসেছেন। বনবিহারী ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল যুববিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ যুদ্ধে অমর শহীদদের পাশে দাঁড়িয়ে সরকারী

ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। আমার লেখা যুববিদ্রোহের সব বইগুলোই সে খুব মনোনিবেশ সহকারে পড়েছে। তার খুব ভালভাবেই ফেণীর ঘটনার বিশদ বিবরণ জানা ছিল। তাকে বললাম "তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমার বইতে যে ফেণী-সংঘর্ষের কথা লিখেছি? সেই যে আমরা চারজন ফেণী স্টশনে সৈন্যব্যূহ ভে'দ করে বেরিয়ে পড়ার পর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম—সে কথাও মনে আছে নিশ্চয়? আর আমি বিচ্ছিন্ন হবার পর একেবারে একা সুদীর্ঘ পথ মাঠ-ঘাট, পাহাড়, টিলা অতিক্রম ক'রে চলেছি? আরও বোধ হয় তোমার মনে আছে যে তাতে লেখা আছে আমি সেই সময় কৌপীন-ধারী হাবা-কালা-বোবা সেজে এবং অর্ধ-পাগলের মতো ভান ক'রে পথ অতিক্রম ক'রে চলেছি? আরও মনে পড়ছে তো, যে বালকদের উৎপাত সহ্য ক'রে ক্ষুধা তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে পড়েছি? তখন কিছু-জল ও আহার্যের জন্য আমি একটি সাময়িক আশ্রয়স্থলের সন্ধানে ঘুরছি? আমার সেই অসহায় অবস্থায় আকুল নয়নে চারিদিক দেখছিলাম কোথাও কোনো বাড়ি দেখতে পাওয়া যায় কিনা সেই সময় আমার চলার পথের কাছেই একটি প্রকাণ্ড বাড়ি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভয়ে ভয়ে সেখানে গেলাম। সেখানেও সেই বিভ্রাট—ছোট ছোট ছেলেদের উৎপাত। কিন্তু তারই মধ্যে ছোট একটি মেয়ে আমার অসহায় অবস্থা দেখে বালকদের ধমক দিয়ে, ছুটে গিয়ে আমার জন্য আহার্য নিয়ে এসে ছিল। আমার বইয়ের পাতায় সেই বর্ণনা তোমার মনে পড়ছে?

আমার প্রিয়বন্ধু বলে উঠলো—"হ্যাঁ-হ্যাঁ, খুব মনে পড়েছে আমরা সেই ঘটনা নিয়ে নিজেদের ভিতরে কত আলাপ-আলোচনা করেছি। খুব উপভোগ্য ঘটনাটি—ঐ যে তখন আপনি নগ্নবেশে পাগল সেজে আত্মগোপন ক'রে পথ অতিক্রম করছিলেন! আরও মনে পড়ছে সেই ছোট্ট মেয়েটির কথা যা আপনি লিখেছিলেন। সেটি পড়ে সত্যিই আমার চোখে জল এসেছিল। ঐ মেয়েটির কোনো সংবাদ কি আপনি পেয়েছেন?" তারপর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—"সে নিজে

খোঁজ না দিলে তাঁর সংবাদ জানার তো উপায়ই নেই। আর সে খবর দেবেই বা কি ক'রে? বইটি যদি তাঁর হাতে গিয়ে পড়ত তাও না হয় যোগাযোগের একটা সম্ভাবনা থাকত। আর বইটি পড়ে যদি তাঁর ঐ ঘটনাটি মনে পড়ে তবেই হয়ত কোনো একদিন চিঠি দিত। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড ও তাণ্ডব চলেছে তাতে তারা কোথায় আছে কে জানে?"

আমি বনবিহারীকে আশ্চর্য করে দেবার জন্য উষারাণীর পোস্টকার্ডটি তাকে পড়তে দিলাম। বনবিহারী পোস্টকার্ডটি হাতে নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করল, কার পোস্টকার্ড? আমি তাকে বললাম—পড়েই দেখ না। সে পড়তে লাগল, আর আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম তার মুখের নানারূপ প্রতিক্রিয়া—বিস্ময়, উৎফুল্লতা, প্রফুল্লতা ও আনন্দের চিহ্ন। সে চিঠিটি আগাগোড়া এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে অতি আবেগভরে বলে উঠল, "এই চিঠি—এই মূল্যবান চিঠিটি আপনার বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে ছাপিয়ে দিতে হবে।" তারপর আবার বলে উঠল যে সে ঐ পোস্টকার্ডটি নিয়ে যাবে এবং এই ঘটনা অবলম্বনে একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখে কোনো পত্রিকায় ছাপাবে। তার ঐরূপ উৎসাহ আমার খুব ভালোই লেগেছিল, তবে সে নিরুৎসাহিত হল যখন তাকে আমি বললাম যে, ইতিমধ্যে আমি এই ঐতিহাসিক অভিনব নাটকীয় ঘটনাটি নিয়ে লিখতে শুরু করেছি। সে অত্যন্ত খুশী হয়েছে ব'লে আমাকে জানাল। আমার বন্ধুবর মিহির বোস সবই শুনছিল, দেখছিল এবং খুব উপভোগও করছিল যখন বনবিহারীকে ঐ পোস্টকার্ডটি পড়তে দিলাম। মিহির আগেই এই পোস্টকার্ডটির সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল। কারণ সে ১৪ তারিখ অর্থাৎ যেদিন পোস্টকার্ডটি পেয়েছি সেই দিনই আমার সাথে জেলে দেখা করতে এসেছিল এবং তখনই আমি তাকে পোস্টকার্ডটি দেখাই।

আজকে কেস ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা আরম্ভ হওয়ার ১০-১৫ মিনিট আগে আমরা এই চিঠি নিয়েই নিজেদের মধ্যে এই

ধরনের কথা বলাবলি করছিলাম। তারপর আমার ভাগনে শ্রীফটিক উপাধ্যায় এসে পড়ে। আমি ফটিক ও তার স্ত্রী সুমিতাকে এই চিঠিটি দেখাব ব'লে এবং "সেই মেয়েটি"র যে সংবাদ পেয়েছি তা জানাবার জন্য আগে থেকেই এই পোস্টকার্ডটির একটি কপি সমীরকে ক'রে আনতে বলেছিলাম। ভাগনে ফটিককে মুখে বললাম যে, সেই ফেণীর ছোট্ট মেয়েটির সংবাদ এত বছর পরে আমি পেয়েছি। এইটি তারই আমাকে লেখা পোস্টকার্ড। আমার তাকে সব কথা বলা হল না। আমি তাকে পোস্টকার্ডটি দিতে যাচ্ছিলাম তাও দেওয়া হল না। তখন আমারই আর একটি ভাই শ্রীসমীর মোদক এসে উপস্থিত হল।

এখানে সমীরের একটু পরিচয় দিই। সে কয়েক বছর আগে আমার সঙ্গে বেশ দীর্ঘদিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। তারপর যদিও বহু বছর বলতে গেলে আমাদের মধ্যে প্রায় সংস্রবই ছিল না, তবুও আমার গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজে থেকে এসে যোগাযোগ করে এবং বিগত ছয় বছর আমার এই বিপদ্‌কালে মামলাসংক্রান্ত বিষয় দেখাশুনা করছে। সমীর, আজ ঢুকতে ঢুকতে বলল যে, শ্রীমতী ঊষারাণী নন্দী তার ছেলেকে আজই তার বাড়িতে পাঠিয়েছিল এবং ছেলেটির সঙ্গে তার কথা হয়েছে। ছেলেটি তাকে বলেছে যে, তার মা তাকে ব'লে পাঠিয়েছেন—তিনি আপনার সঙ্গে জেলে আগামীকালই বিকেল চারটার সময় দেখা করতে আসবেন।

আমাদের সবারই সংবাদটি শুনে খুব ভালো লেগেছে। কতখানি যে আমার আনন্দ হয়েছিল, তা এখন ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই কাজের সময়ে যদিও আমি খুব উৎফুল্ল হয়েছিলাম, তবু সেই উল্লাসের আতিশয্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিলাম না। এখন আমরা যখন সবাই উপস্থিত হয়েছি এবং আর কারো আসার বাকি নেই, তখন আজকের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য কার্যসূচী নিয়ে আলোচনা শুরু করা সমীচীন মনে করলাম। তখন চারটা বেজে পনেরো মিনিট

হয়েছে। তখন থেকে একটানা প্রায় সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত আমরা মামলার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছি। তার মধ্যে আর একটি আলোচ্য বিষয় ছিল চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থার পঞ্চম বার্ষিকী সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাব সম্পর্কে। ঐ গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, অনন্ত সিং ও তার ৩৩ জন সহবন্দীদের মুক্তি ও সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের মামলার অবিলম্বে পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্য, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানিয়ে যেন সেই প্রস্তাবের সারমর্ম তারবার্তার মাধ্যমে পাঠানো হয়, আর সেই প্রস্তাব দু'টি সম্বলিত দু'টি স্মারকলিপি যেন উপযুক্ত প্রতিনিধি দলের মারফত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। এই ও কর্মপন্থা স্থির করার পরেই উঠে যাবার সময় সমীরকে বললাম পোস্টকার্ডের নকলটি সুমিতাকে দেবার জন্য ফটিককে দিয়ে দিতে। আমাদের এই আলোচনা শেষ করেই তারা চারজন উপরোক্ত প্রস্তাবটির কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমার বন্ধু শ্রীগণেশ ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করতে তাঁর বাড়ি গেল।

"কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেনরে এতদিন পরে, জাগিয়া উঠিল প্রাণ?"

॥ ৩ ॥

তারা চলে গেল। আমারও এখন জেলের অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ফিরে যেতে হবে। জেল ঘটকটি অভ্যন্তরে প্রবেশ করার জন্য খুলে দিল। আমি জেলের কম্পাউণ্ডে ঢুকলাম। এখান থেকে প্রায় একশ গজ হেঁটে দেওয়ালে ঘেরা 'সেল-ইয়ার্ডে'র মধ্যে আমার নির্দিষ্ট সেলকক্ষটিতে এলাম। জেল অফিসে যতক্ষণ আমরা কর্মসূচী নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম ততক্ষণ, ঊষা যে আগামীকালই দেখা করতে আসবে তা শোনা অবধি আমার ভাবপ্রবণ মনের সব আবেগ, সব ব্যাকুলতা, শত-সহস্র উচ্ছ্বাস মনের অতলে চেপে রেখেছিলাম। এখন আমি একা। একান্তে নিজের গহন মনের ভাবতরঙ্গে আমি যেন ভেসে চললাম। আমার জীবনের বহু ঈপ্সিত এক মনোরম মুহূর্তে ও আসন্ন ঐতিহাসিক সাক্ষাতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেলাম!

পঁয়তাল্লিশ বছর আগে আজকের ঊষারাণীকে সেদিন যখন আমি দেখি, তখন সে একটি নয়-দশ বছরের ছোট্ট বালিকামাত্র। এ ভিন্ন তার আর কোনো পরিচয়ই আমি জানতাম না। তবে নিজের চিন্তা দিয়ে, আমার মানসপটে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে তার একটি বিশেষ পরিচয় আমি আবিষ্কার করেছিলাম। সেদিন একবারের জন্যও কি আমি ভাবতে পেরেছিলাম, ভবিষ্যতের কোলে কি লুকিয়ে আছে? ক্ষণিকের জন্যও কি ভাবতে পেরেছিলাম, সেই বালিকা পঁয়তাল্লিশ বছর পরে নিজেই আমাকে দাদা ব'লে বরণ করবে এবং ছোট বোনের দাবি জানাবে? একটি ছোট বোন হিসাবে নিজেকে স্বাধিকারের আসনে বসাবে?

এই মধুর কল্পনা যখন আর কল্পনায় রইল না।—তা বাস্তবে

প পরিগ্রহ করেছে, আর যখন আমার সেই ছোট্ট বোনটি আমারই সঙ্গে আগামী কালই দেখা করতে আসবে জেনেছি, তখন অভাবনীয় সেই শুভ-সাক্ষাতের চিন্তায় কি আমার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠবে না—স্নেহমমতার প্লাবনের প্রবাহ কি আমার অন্তরে প্লাবিত করবে না?

আমার মনে হতে লাগল ঊষাও আমাদের এই আশু ঐতিহাসিক মনোরম সাক্ষাতের কথা আমারই মতো ভেবে ভেবে আকুল হয়ে উঠেছে। সেও আমার মতো অস্থির, উদ্‌গ্রীব ও অশান্ত চিত্তে একটি একটি করে মুহূর্ত গুণছে। আর তা না হলে কেন সে চিঠিটি লিখেছিল? কেন সে দেখা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিল? কেন চিঠির উত্তর পাওয়া মাত্রই কালবিলম্ব না ক'রে ছেলেকে সমীরের কাছে পাঠিয়েছে? কেন সে ব'লে পাঠিয়েছে পরের দিনই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে? এ যে এক মধুর স্বপ্ন—ভাবতেও অবাক লাগে! ভেবে ভেবে নিজেকে ধন্য মনে হয়—আমার শেষ জীবনেও ভাই বোনেদের আমার প্রতি এতখানি আস্থা, এত নির্ভরতা! এতখানি আত্মীয়তার পরিচয় পেয়ে আমি গর্ব অনুভব করি। আমার প্রতি এতখানি বিশ্বাস দেখে আমি যে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ি। কেবলই মনে হচ্ছিল আমি কি আমার ভাই ও বোনেদের এতখানি আস্থাবান হওয়ার উপযুক্ত?—স্নেহের ছোট বোন ঊষার দাদা হওয়ার উপযুক্ততা কি আমার আছে? চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

ভোর হল। ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠলো আলো, হল সকাল—একটি সুন্দর সকাল। বহু প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎটি আজ আমার জীবনে ঘটতে চলেছে। আমার জীবনে এটাই হচ্ছে শুভ দিনের—একটি নব সূচনা। জেলের সীমিত অবস্থার মধ্যেও আমার ফিরে-পাওয়া হারানো বোনটির মর্যাদা যেন একটুও ক্ষুণ্ণ না হয়, আর আমার পক্ষে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতেও যেন কোনো ত্রুটি না থাকে, তারজন্য আমার তো চেষ্টা করা উচিত। ঠিক করলাম সকাল দশটা নাগাদ নিজে অফিসে

গিয়ে জেলারবাবুকে অনুরোধ জানাব যেন আমাদের বসার জন্য একটু *সুব্যবস্থা ক'রে দেন। গতকাল সন্ধ্যায় আমি অফিস ছেড়ে চলে* আসার মুখে জেল-সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাছে আমার সঙ্গে শ্রীমতী ঊষারাণীর দেখা করতে আসার কথা জানিয়েছিলাম এবং তাঁকে বলে ছিলাম, সাক্ষাতের সুব্যবস্থা হলে খুব বাধিত হব।

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, শ্রীরণেন্দ্রনাথ মুখার্জী অনেক আগেই আমার লেখা বইগুলো পড়েছিলেন। তাই তাঁর বুঝতে কোনো অসুবিধাই হয় নি, যখন তাঁকে আমি শ্রীমতী ঊষারাণীর পোস্টকার্ড এবং ফেণী-স্টেশনে সংঘর্ষের পর ফেণী-বিলোনিয়ার পথে 'কৌপীনধারী পাগলের' সঙ্গে একটি নাবালিকার সাক্ষাৎ ও তার সেই ক্ষুধার্ত 'পাগল-ভিখারী-অতিথি' সেবার কথা বলি। তিনি শুনে তক্ষুনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—কোনো অসুবিধাই হবে না। সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েও কিন্তু আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না, কারণ—আমার প্রায় ত্রিশ বছরের জেল অভিজ্ঞতা একথাই বলে যে, সেরূপ আশ্বাসের ওপর পুরোপুরি ভরসা রাখা উচিত নয়। নানা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার জন্য সব নির্দেশ অধস্তন কর্মচারীদের কাছে সব সময় ঠিকমতো পৌছায় না। তাই এক্ষেত্রে শ্রীমতী ঊষারাণীর যেন কোনো অসুবিধাই না হয়, তার আরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার জন্য জেলারবাবুকেও জানানো উচিত মনে করলাম।

সকাল দশটা বাজতে এখনও কিছু দেরি আছে। প্রাতরাশ করার পর খবরের কাগজ নিয়ে বসেছি—এখন সকাল প্রায় সাড়ে-আটটা হবে। প্রায় এমন সময় আমার সঙ্গে অভিযুক্ত সহবন্দীবন্ধুরা, যারা এই জেলে আছে তাদের মধ্যে অনেকেই আমার কাছে আসে। তারা সবাই অল্পবয়স্ক যুবক। সবাই তারা শিক্ষিত—তাদের মধ্যে আবার কেউ শিক্ষক, কেউবা অধ্যাপক। আমি তাদের সঙ্গে সাধারণতঃ মামুলি কথাবার্তা বলি এবং বিশেষ ক'রে আমাদের মামলা সম্বন্ধেই বেশীর ভাগ সময় গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকি। সাক্ষীদের

জেরা করার ব্যাপারে ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আইনসংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়েও পরামর্শ ক'রে থাকি। মামলার প্রস্তুতির ব্যাপারে তাদের সাহায্য আমার পক্ষে একেবারে অপরিহার্য।

সহবন্দী বন্ধুরা প্রায় সবাই আমার লেখা সব ক'খানি গ্রন্থই পড়েছে। ১৪-২-৭৫ তারিখে আমি যখন শ্রীমতী ঊষারাণীর কাছ থেকে সেই অপ্রত্যাশিত পোস্টকার্ডটি পাই, তখন উৎসাহের সঙ্গে তাদের সেটি দেখিয়েছিলাম। তাদের মুখে মুখে একটি ঐতিহাসিক নাটকের কথা জেলের মধ্যে আমাদের আরও অনেকের কাছে ছড়িয়ে পড়ল। আমি যে কল্যাণীয়া ঊষাকে খুব বড়ো ক'রে একটি উত্তর দিয়েছি, তাও তাদের জানিয়েছিলাম। উৎসাহের সঙ্গে তারা এ নিয়ে অনেক গবেষণাও করেছে—কবে সে আসছে, চিঠি পেয়েছে তো, নাও পেতে পারে, আর পেলেও কবে নাগাদ তা তার পাবার সম্ভাবনা, আমিও বা কবে শ্রীমতী ঊষার কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার আশা করি, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বাস্তব-অবাস্তব প্রশ্ন তারা করেছে এবং বহু প্রকারের সম্ভাব্য উত্তরের সাহায্যে নিজেরাই সেসব ঔৎসুক্যের সমাধানও করেছে। তবুও সবার কাছে মূল জিজ্ঞাসা ছিল—তিনি আসছেন কিনা এবং এলেও আমার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তারাও শ্রীমতী ঊষাকে দেখতে পাবে কিনা?

গতকাল সন্ধ্যায় আমি খবরটি পেয়েছিলাম—ঊষারাণী আমাকে চিঠির উত্তর দেবার অপেক্ষা না করেই তার ছেলেকে সমীরের কাছে পাঠিয়ে জানিয়েছে যে, সে আজই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। আমার যুবকবন্ধুদের এই সংবাদ আগে দেওয়া সম্ভব ছিল না। আমি একেবারে একা থাকি আর তারা থাকে জেলের মধ্যেই অন্যত্র পৃথক পৃথক স্থানে। সকালে তারা আমার এখানে এলেই আমার পক্ষে তাদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব। এই শুভ-সংবাদটির জন্য তারা সবাই খুব উৎসুক হয়ে আছে—তা আমি ভালোভাবেই জানি। তা ছাড়া শ্রীমতী ঊষারাণীর কাছ থেকে আমার চিঠির উত্তর এসেছে—এটুকু

সংবাদ পেলেও তারা খুব খুশী হ'ত ; কিন্তু তারা একেবারে অবাক হল, যখন আমার কাছ থেকে শুনল—শ্রীমতী ঊষা আজই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। কি এক মনোহর দৃশ্য। বন্ধুরা খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সবার চোখ-মুখ এক প্রশান্ত মৃদু হাসির আভাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মঞ্চে নাটক দেখার সময় প্রতিটি দৃশ্য শুরু হবার আগে দর্শকরা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। আবার হয়ত কোনো কোনো রোমাঞ্চকর দৃশ্যের পটপরিবর্তনের আগতপ্রায় মুহূর্তে যেরূপভাবে দর্শকদের উদ্বেলিত হৃদয়ের অধীরতা প্রকাশ পেতে দেখি—সেইরূপ প্রতিক্রিয়া আমি আমার তরুণবন্ধুদের মধ্যেও দেখলাম। সবার মনে একই প্রশ্ন—কি উপায়ে শ্রীমতী ঊষারাণীকে তারা একবার দেখে আসবে—আর বিশেষ ক'রে দেখবে আমার আবেগময় অভিব্যক্তিগুলো ও শ্রীমতী ঊষার অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার ছবি !

প্রায় দশটা বাজে। আমি জেলারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে নিজেই অফিসে গেলাম। সব ব্যাপারটি খুলে ব'লে তাঁকে অনুরোধ জানালাম যেন অফিসের মধ্যেই একটি পৃথক স্থানে অন্ততঃ আর কয়েকটি বেশী চেয়ার রাখার ব্যবস্থা করেন এবং আমি যেন ৪টা বাজার মিনিট পাঁচেক আগে থাকতেই অফিসে উপস্থিত থাকতে পারি। যদিও আমার জানা ছিল, সমীর আগে থেকেই উপস্থিত থাকবে এবং সে-ই কল্যাণীয়া ঊষাকে ও তার ছেলেকে অভ্যর্থনা করবে, তবু ট্রাম-বাসের পথ ব'লে যদি ঠিক সময়মতো সমীরভাই নাও এসে পৌঁছাতে পারে। তাই ঐরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার কথা ভেবে আগে থেকেই চিঠিতে আমি শ্রীমতী ঊষাকে সেইরূপ একটি আভাষও দিয়েছিলাম। আমি ঊষাকে চিঠিতে লিখেছিলাম, আমি নিজে ডি, ও-র টেবিলের পাশে মিনিট পাঁচেক আগে থাকতেই বসে থাকব, আর আমাকে চিনতে যাতে তার কোনো অসুবিধা না হয়, তারজন্যে আমার কালো মোটা ফ্রেমের চশমা, পাকা চুল, বয়স, শারীরিক গঠন প্রভৃতির বিবরণও দিয়েছিলাম। তাছাড়া যখন আমার জানা আছে যে

কল্যাণীয়া উষা তার ছেলের সঙ্গে আসবে, তখন আমারও তাদের অনুমানে চিনে নেওয়াটা বিশেষ অসুবিধা হবে ব'লে মনে হয় নি।

মধ্যাহ্নভোজের পর যেমন রোজই একটু বিশ্রাম করি, আজও সেই বিশ্রামান্তে নিজের চেয়ারে এসে বসলাম। আমার পাহারাকে (জেলের আইন অনুযায়ী, যে সমস্ত সাজাপ্রাপ্ত বন্দীরা অন্যান্য বন্দীদের দেখা-শোনা করার এবং বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হয়, তাদের পাহারা বলে।) আগে থেকে জানিয়ে রেখেছিলাম যে, সামান্য একটু জলযোগ ক'রে চারটা বাজার দশ-মিনিট আগে আমি এখান থেকে জেল অফিসের উদ্দেশে রওনা হব। ঠিক সময় আমি বেরিয়ে পড়লাম। জেল-ফটকে পৌছাতে তিন চার মিনিটের বেশী সময় লাগে না। আমার পৌঁছাবার পর জেলের ভিতরের দিকের সদর দরজার আর একটি ছোট অংশ কারারক্ষী খুলে দিল। আমি চারটা বাজার ছয় মিনিট আগে উপস্থিত হয়েছি—যেন শ্রীমতী উষারাণীকে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়। এতদূর থেকে না জানি সে কত কষ্ট ক'রে আসছে! তাই কল্যাণীয়া উষার খানিকটা কষ্ট লাঘবের জন্যও আমার দরদী মন উৎকণ্ঠিত ছিল।

সদর ফটকের ভেতরে প্রবেশ ক'রেই যখন আমার সাক্ষাৎ করার ঘরের সামনে সমীরকে দেখলাম আমাকে স্বাগত জানাবার জন্য উন্মুখ হয়ে পায়চারি করছে, তক্ষুনি আমার উৎকণ্ঠার নিরসন হয়েছে—বুঝলাম কল্যাণীয়া উষা আগে থেকেই আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছে। আর মাত্র দু'-এক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমি শ্রীমতী উষাকে দেখতে পাব। নিমেষের ব্যবধান, তবু মনের গতি এত দ্রুত যে অনেক কথাই এক মুহূর্তে ভেবে ফেললাম। উষাকে আমি কি বেশে দেখব? শ্রীমতী উষার চিঠি পাওয়া অবধি একটি অকল্যাণকর কথা আমি সব সময়ই দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছি। সে তার স্বামীর বিষয় চিঠিতে একটি কথাও উল্লেখ করে নি কেন? তার স্বামী বর্তমানে কোথায়, এখন কি করছেন এবং আগেই বা তিনি কি করতেন—সে সব বিষয়ে উষা

একেবারেই নীরব, তাঁর চিঠিতে তাঁর সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করে নি কেন? তাই আমার অন্তরের মধ্যে একটি ঝড় বয়ে যাচ্ছিল—স্নেহের বোনটিকে আমি কি বেশে দেখব—সধবার না বিধবার বেশে! বোনটি কি আমার সধবা নেই—মাথায় তার সিঁদুর থাকবে না, থাকবে থান কাপড় পরনে—তা যেন আমি ভাবতেই পারছিলাম না। এইরূপ অবাঞ্ছিত অনিশ্চয়তার আশংকা ঘুরে ঘুরে আমার হৃদয়ের সূক্ষ্মতন্ত্রীতে বার বার আঘাত করছিল। মাত্র দু'-তিন নিমেষের মধ্যে কল্যাণীয়া ঊষাকে দেখতে পাব, আর সেই সঙ্গে হবে আমার সব আশা-আশংকার নিরসন। তবুও মাত্র এই কয়টি মুহূর্ত আমার পক্ষে অতিভয়ানক ও বিভীষিকাময় ছিল। যদি······? না, না, তা কোনো মতেই হতে পারে না। তা হলে যে আমার সব আশীর্বাদ, সব মঙ্গল কামনা, এত সব কুশল চিন্তা, এতদিনের সব শুভ ইচ্ছা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাও কি কখনও হতে পারে! না, না ঊষারাণীর তেমন অমঙ্গল কখনই হওয়া সম্ভব নয়! আমি বুক বেঁধে শক্ত হয়েছি।

"বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে অমানিশা গেল কাটিয়া
তোমার খড়্গ আঁধার মহিষে দু'খানা করিল কাটিয়া

॥ ৪ ॥

আমি দু'-এক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। আমার হৃদয় মহাআনন্দে নেচে উঠল। ঊষা ও তার ছেলে উঠে এসে আমার পায়ের ধুলো নিল। সমীর পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিল তার আর প্রয়োজন হল না। পরিচয় করাবার অপেক্ষা আমরা কেউই আর রাখি নি। এই পরিবেশে আমাদের পরস্পরকে বুঝে ও চিনে নিতে একটুও অসুবিধা হয় নি। ছেলেটিকে দেখেই আন্দাজ করেছি সেই ঊষার ছেলে। মা ও ছেলে আমার পায়ের ধুলো নেওয়াতে আমি খুবই বিব্রত বোধ করছিলাম। এইটি আমার চিরকালের স্বভাব —কেউ আমার পায়ের ধুলো নিক, তা আমি কোনো সময়েই চাইতাম না। তাই তাদের আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বারণ করেছিলাম, প্রায় বাধা দেবার মতো চেষ্টাও করেছি—"না না পায়ের ধুলো আবার কেন! এমনিতেই আমি আশীর্বাদ করছি।" ঊষা বলল—"তাও কি হয়? আপনি আমাদের থেকে কত বড়ো! আপনার পায়ের ধুলো না নিয়ে কি আমরা পারি?" আমি আর কথা বাড়ালাম না। তারপর আমিও একটি চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লাম।

কি কথা বলব। সব কথাই যেন হারিয়ে ফেলেছি। অনর্থক একটি দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেয়ে পরম শান্তি অনুভব করেছি। বোনটিকে দেখে খুব ভালো লাগলো। ঊষার সিঁথিতে সিঁদুর, পরনে পাড়যুক্ত শাড়ি, হাতে দু'-তিনটি সোনার চুড়ি, আর দেখলাম শাঁখা ও একটি লোহার বালা এবং গলায় সামান্য একটি সোনার চেন। আমার সামনে আমার ছোট ভাগনেটি (ঊষার ছেলেটি) বসে আছে। সমীর সেখানে

উপস্থিত ছিল। সেই ঘরে দু'তিনজন জেলকর্মচারী তাঁদের সামনের একটি টেবিলের ওপর খাতাপত্র নিয়ে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মিনিট চার-পাঁচেক যেতে না যেতেই জেলারবাবু একবার একটুখানি ঘরে ঢুকে আমাকে *জিজ্ঞাসা করলেন—"সব ঠিক আছে তো ?" অর্থাৎ আমি যে* তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম—আমাদের বসার যেন একটু সুব্যবস্থা করে দেন—সেইটি তিনি জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি আমার সেই ঐতিহাসিক বোন ঊষারাণীকেও যে একবার চাক্ষুষ দেখতে এসেছিলেন সেইটি বুঝেই তাঁকে আমি বললাম—"ইনি আমাকে সেইদিন পঁয়তাল্লিশ বছর পরে তার পরিচয় দিয়ে একটি পোস্ট-কার্ড লিখেছিলেন। জেলারবাবু তাকে নমস্কার জানালেন আর ঊষারাণীও তাঁকে জানাল প্রতিনমস্কার। জেলারবাবু তখনই চলে গেলেন।

মনের মধ্যে অনেক কথাই ভিড় ক'রে আসছে। কি নিয়ে কথা শুরু করব, কোথা থেকে প্রসঙ্গটি আরম্ভ করব—সেই কথাই ভাবছি। এরূপ একটি আবেগপূর্ণ অবস্থায় যে আমাদের আর কথা বলার কিছু থাকবে না—নির্বাক কয়েকটি মুখ কেবল পরস্পরের দিকে চাওয়াচায়ি ক'রে বসে থাকবে—তা বুঝেছিলাম ব'লে আমি আগে থেকেই আমার লেখা 'চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ'র প্রথম খণ্ড এবং 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড-'এর বাহান্নটি পূর্ণ পাতা যাতে আমার লেখা, "Chittagong Heroes' Fight For Ereedom" প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোও আমার সঙ্গে ক'রে এনেছি। এগুলো সব আমার হাতের কাছে থাকাতে কথা বলার খুবই সুবিধা হল।

আমি কথা পাড়লাম—"আচ্ছা, তোমার বোনপো আমার বই পড়ে 'সেই মেয়েটি' যে তুমিই, তা কি ক'রে বুঝল ? আমি তোমাদের গ্রামের নাম জানতাম না—তাই বইতে তা উল্লেখ করি নি। তোমার চিঠি পড়ে বুঝেছিলাম তুমি বইটি তখনও পড়নি।" এক নিঃশ্বাসে অনেক ব'লে ফেললাম। সে বলল—"আমার সেই বোনের ছেলে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তার এক বন্ধুর কাছ থেকে বইটি নিয়ে পড়েছে। তারপর বইটি আর পাই নি, কেনাও হয়ে ওঠে নি। সে আমার বড় বোনের ছেলে। বালিগঞ্জে তাদের বাড়ি—পারলে ফেরার পথে আজই তাদের ওখানে যাব। নইলে পরে আর একদিন দেখা করব। আমার সেই বোনের ছেলে ফেণী-বিলোনিয়ার পথে আমার বাপের-বাড়ির সকল বর্ণনা, যা আপনার বইতে লেখা আছে, তা থেকে ঐটি যে আমাদের বাড়ি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিল। তাছাড়া সেই সময়, ১৯৩০ সালে আমাদের বাড়িতে বর্ণনা অনুযায়ী নয়-দশ বছরের সে রকম মেয়ে আমিই ছিলাম।" তারপর ঊষা একটু হিসেব ক'রে নিয়ে বলল—তখন তার বয়স পুরো দশ হয় নি, সাড়ে নয়ের কাছাকাছি। তারপর আরও বলতে লাগল—সেদিন সে আমাকে কি খেতে দিয়েছিল তা সে এখন সব ঠিক ঠিক মনে করতে পারছে না। আমি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম—"তুমি চারযুগ আগে আমায় কি কি খেতে দিয়েছিলে এখন কি তা তোমার মনে থাকতে পারে—না মনে রাখা কারো পক্ষে সম্ভব ?" আমার বলা শেষ হল না। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে মিহির ঘরে ঢুকলো। গতকাল আমার কাছ থেকে সে জেনে গিয়েছিল আজ ফেণী গ্রামের বহুবছরের হারানো সেই ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে জেলের পরিবেশে আমাদের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎটি অনুষ্ঠিত হবে। বাস্তব জীবনের এইরূপ আবেগময় ও নাটকীয় জ্বলন্ত একটি দৃশ্যের অভিনয় দেখতে বা উপভোগ করতে কার না ইচ্ছে করবে ? মিহির প্রায় বিশ বছরের অধিক কলকাতার পৌর-সভার একজন অভিজ্ঞ ভিজিলেণ্ট অফিসার ছিল। বর্তমানে সে মানিকতলার খুব বড়ো একটি নতুন মার্কেটের (বাজারের) স্পেশাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। আজকে অফিসের কাজ অনেক আগে সেরে সেই মানিকতলা থেকে সে ছুটে এসেছে আমাদের সাক্ষাতের দৃশ্যটি দেখার জন্য। তার সঙ্গে শ্রীমতী ঊষার পরিচয় করিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজনই হল না। মিহির নিজেই শ্রীমতী ঊষারাণীর কাছে আত্মপরিচয় দিল এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে 'দিদি'

সম্বোধন ক'রে কল্যাণীয়া উষার স্বাভাবিক কোমলতাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করল।

শ্রীমতী উষা ঢাকা দেওয়া সুন্দর একটি বাটিতে নতুন গুড়ের পায়েস এনেছে এবং নিজের হাতে তৈরী ক'রে এনেছে অনেক সন্দেশ। হাতে করে প্রথমেই আমি ভাগনেটিকে ও পরে উষাকে সন্দেশ তুলে দিলাম। সমীর ও মিহির বাদ পড়ল না, আর আমি নিজেকেও বঞ্চিত করলাম না—তাদেরও দিলাম আর নিজেও নিলাম। অবশ্য ব্যবস্থার অভাবে পায়েস কাউকে দেওয়া হল না, সেইটি স্বার্থপরের মতো আমার জন্যই রাখলাম। যে 'পাহারা' জেলে আমার পরিচর্যা করে, সমীর তাকে বলল, সে যেন ওগুলো নিয়ে যায় এবং পায়েস ঢেলে রেখে বাটিটি যেন ধুয়ে নিয়ে আসে। 'পাহারা' ঐ পায়েসের বাটি নিয়ে চলে গেল।

মিহিরকে খুব ইচ্ছুক দেখলাম সে ঐ নাটকীয় ঘটনার বিশদ বিবরণ শ্রীমতী উষার মুখে শুনবে। তাই সে প্রশ্ন করল: "দিদি, আপনার এই ঘটনাটি কি মনে ছিল, আপনাদের বাড়িতে কয়েকটি মন্দির ছিল, শান-বাঁধানো ঘাট, বড়ো পুকুর, বাড়ির সামনে রাস্তা প্রভৃতি কি সব ঠিক ঠিক মিলেছে? সেই সময় আমি মিহিরকে "চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ" বইটি দিয়ে মাত্র সেই বিশেষ দু'টি পৃষ্ঠা জোরে জোরে পড়তে বললাম। যেন উপস্থিত সবাই শুনতে পায়। সেই কটি পাতা মিহির ধীরে ধীরে পড়ছিল যেন আমাদের শুনতে কোনো অসুবিধা না হয়। পড়ার সময় আবেগ এবং উচ্ছ্বাসে মিহিরের গলা যেন মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ভাগনেটি খুব ধীর-স্থিরভাবে বসে ছিল। তার মায়ের সম্বন্ধে যখন এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি আমার বই থেকে পড়া হচ্ছিল, আর 'সেই আমিই' যে এখন তার সামনে বসে, যে তখন আত্মগোপন ক'রে পাগল সেজে এক নিদারুণ পরিস্থিতিতে একমুঠো অন্নের জন্যে তার দাদামশাইয়ের বাড়ি গিয়েছিল এবং যখন তার মা মাত্র নয় বছরের একটি বালিকা, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এক অপরিচিত পাগল অতিথিসেবা করেছিল—তা শুনতে শুনতে,

আমার মনে হল, সে অতীতের এক স্বপ্নরাজ্যের কল্পনায় ডুবে গেছে। তার চোখ ছলছল। তার মায়ের চোখে অশ্রু। আর আমাকে কয়েকবারই চোখ মুছতে হল। মিহির শেষ ক'টি লাইন গভীর আবেগের সাথে পড়ল—"......যদি কোনো দিন এই সামান্য ঘটনা তোমার মনে পড়ে তবে জানবে, উন্মাদ বেশে যে ক্ষণিকের অতিথি তোমাদের বাড়ি গিয়েছিল সে আর কেউ নয়—ভারতের মুক্তিযুদ্ধের একজন সৈনিক—অনন্ত সিংহ।"

কারো মুখে কথা নেই—সবাই নীরব। আর এই নীরবতাই ঘরটির পরিবেশকে ক'রে তুলল আরও গম্ভীর। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য সবাই উন্মুখ। কি ভাবে হাল্কা আলাপের অবতারণা ক'রে পরিবেশকে স্বাভাবিক করা যায়—সেই কথাই ভাবছি, ঠিক এমনি সময় চা বা কফি নিয়ে গোপাল ও সুবোধ ঘরে ঢুকল সুবোধ আমার পাহারা, জেলের মধ্যে আমার খাওয়া থাকার তদারক করে। আমরা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। সবাই এবার চা-পানে মনোযোগ দিলাম। কিন্তু এই চা বা কফির পরিবেশে আমি একটু ব্যতিক্রম—আমি কোনোটাতেই অভ্যস্ত নই। মনে মনে বড়ো অস্বস্তি অনুভব করি যখন দেখি সবার মাঝে আমি একাই চা খাই না। কিন্তু আজ এখানে আমি একা নই—আমার মতো আমার সদ্য পরিচিত ভাগনেটিরও চা বা কফিতে একটুও আসক্তি নেই। খুব বিনয়ের সঙ্গে চা পানে তার অনিচ্ছার কথা জানাল। সমীর তখন বলল যে, গতকাল সে যখন ওদের বাড়িতে গিয়েছিল, তখন তাকে সমীর চা দিয়ে খুব বিব্রত করেছে। আমি বললাম—"বেশ বেশ, খুব ভালো, আমার মতোই তোমারও চায়ের নেশা নেই।" সঙ্গে সঙ্গে ভাবলাম এই বয়সে তার এরূপ চায়ের প্রতি বিরূপভাব খুবই প্রশংসনীয়। আজকের যুগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থেকেও একজন অল্প বয়সের যুবকের পক্ষে কি ভাবে সম্ভব হল চা পানের আকর্ষণ থেকে দূরে থাকা! এতে তাদের বাড়ির ও মাতা-পিতার

অনুরূপ প্রভাব প্রতিফলিত হয়—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না।

এতক্ষণ পরে তাকে প্রশ্ন করলাম—"তোমার নাম কি?" সে বলার আগেই উষা বলল—"ওর নাম বিপ্লব।" আমি জানতে চাইলাম—"এ নামটি কে রেখেছে, তুমি?" একটু সলজ্জভাবে বোনটি আমাকে জানাল এই নামটি সে-ই রেখেছে। সে তার বড়োছেলের নাম রেখেছে বিক্রম, ছোটটির বিধান। আমি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ব'লে উঠলাম—"চমৎকার। বিক্রম, বিপ্লব আর বিধান—অপূর্ব নাম তিনটি!" সেই সময় মোটামুটিভাবে আরো জেনে নিলাম বড়ো ছেলে বিক্রম কোনো এক Post-Graduate Central teachers Institution-এ পড়ায় এবং বর্তমানে ঐ Institution-এর তত্ত্বাবধানে সে এক বছরের একটি Higher Training Course পড়ার জন্য লণ্ডনে গিয়েছে। উষার বড়ো ছেলেটি বিবাহিত। বৌমা এম-এ পাস। দ্বিতীয় ছেলে বিপ্লব Physics Honours নিয়ে B.Sc পাস করেছে এবং বর্তমানে Welfare Training Course পড়ছে। আর সেই সঙ্গে Law পড়ছে। ছোট ছেলেটি Honours নিয়ে B. com পড়ছে। উষার তিন মেয়ে তার মধ্যে দু'জনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মঞ্জুর এখনও বিয়ে হয় নি। উষার স্বামী বর্তমানে খুব অসুস্থ এবং তিনি এমন কি গাড়ি করেও কোথাও যাতায়াত করতে পারেন না। মাথা ঘোরে। বিপ্লবরা বর্তমানে নিমতায় একটি বড়ো ভাড়াটে বাড়িতে থাকে।

উষার কাছে আরও শুনেছি তার শ্বশুরবাড়ি কুমিল্লাতে। তার স্বামী চট্টগ্রামে চকোরিয়া Govt High school-এর প্রধান শিক্ষক হিসাবে দশ বছর চাকরি করেছেন। তারপর তারা বাংলার বাইরে চলে যান। তার স্বামী উত্তরপ্রদেশের কোনো একটি জেলায় রেল অফিসে চাকরি করতেন। তারা মাত্র বছর দুয়েক হল পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসেছে। সমীরের কাছে শুনেছি তিনি প্রথমে সরকারী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

পরে রেল অফিসে চাকরি করেন। পারিবারিক খবর এবং প্রত্যেকের সম্বন্ধে আরও একটু বেশী করে জানার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। সবার বিষয়ে লিখে নেবার জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের পরিচিতি ও ঊষার শ্বশুরবাড়ির বিভিন্ন খবরা-খবর জানার অনুকূল পরিস্থিতি, সময় ও সুযোগ ক'রে উঠতে পারি নি। তাদের খবরাখবর কেবল আত্মীয়তা গড়ে ওঠার জন্যই যে জানার প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম, তা নয়, বিশেষ করে জানবার তাগিদ ছিল ভবিষ্যতে এই বিচিত্র জীবন কাহিনীর শেষ অংশটুকুও আমাকেই লিখে রেখে যেতে হবে মনে ক'রে। কিন্তু এই প্রথম সাক্ষাৎকারে আমার তাদের সব পরিচিতি জানা হল না।

যেটুকু পরিচয় পেলাম এখন তা নিয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হল। মিহির এতক্ষণ আমার বইয়ের পাতা থেকে এই ঘটনা সম্বন্ধে আরও কয়েক পাতা নিজে নিজেই পড়ে যাচ্ছিল। তারপর সকলের, বিশেষ ক'রে ঊষারাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে জোরে জোরে পড়তে লাগল :

"প্রায় আট বছর পূর্বে একবার আমি আমার মামাদের সঙ্গে আগরতলার পাহাড়ে শিকারে যাই······আজও আমার মনে আছে সেই সময় মামা আমাকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে দেশের ভাষায় বলেছিলেন—'হেরে, তুই হেতেই জম্যা গেছচ্? হে আর তুই দেখছচ্ কি? জলের লাগ্যা হেমন হেমন সময় গেছে যহন্ ছাতি ফাট্যা গেছে। এক ফোঁটা জলের লাগ্যা হাতীর লাদ্দা চিপ্পা জল কর‍্যা খাইছি।"—মামা বললেন, এমনও মাঝে মাঝে হয়েছে যে হাতীর বিষ্ঠা নিংড়ে নিয়ে খেয়ে ওঁরা পিপাসা নিবারণ করেছেন। তখন কথাটা শুনে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩০ সালের ২৩ এপ্রিল, বিলোনিয়ার পথে আমার যা অবস্থা হল, তাতে মামার সেদিনকার কথা অতি সত্য বলেই মনে হচ্ছিল।

"সেদিন এক ফোঁটা জলের জন্য আমি অনায়াসে সেরকম সব

কিছুই করতে পারতাম। চোখের সামনে জল বা খাদ্যের ব্যবস্থার কোনো উপায় আছে ব'লে মনে হচ্ছিল না। এমন সময় প্রায় ছ'-সাতশ' গজ দূরে একটি বড়ো পাকাবাড়ি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বাড়িটির মস্ত কম্পাউণ্ড পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাড়ির গেট দিয়ে রাস্তাটা সোজা বেরিয়ে ফেনী-বিলোনিয়ার বড়ো রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। বেরোবার মুখে বাড়ির এই রাস্তার ডান পাশে একটি বড়ো দীঘি, তাতে বাঁধানো পাকা ঘাট। কম্পাউণ্ডের মধ্যে সাজানো গোছানো সুন্দর একটি মন্দির। মন্দিরটি খুব বড়ো না হলেও চোখে পড়বার মতো। মাঝারি ধরনের তো বটেই। এখন মনে পড়ছে বোধহয় পাশাপাশি দু'টি মন্দির ছিল। মন্দিরের অস্তিত্ব, বাড়ির কর্তা এবং তাঁর প্রভাবে অন্যান্যদের মানসিক গঠন ও চরিত্র কিরূপ হতে পারে, সেই রূপ প্রাথমিক গবেষণায় সাহায্য করেছিল।

"ঐ বাড়ি এবং একটি বা দু'টি মন্দিরের মধ্যে অবস্থান সম্বন্ধে আজ বিশেষ ক'রে উল্লেখের মধ্যে আমার অন্য একটি উদ্দেশ্য। এই লেখাটি যদি বাড়ির সেই দিনের সেই দয়াময়ী বালিকাটি কোনো দিন পড়েন, তবে তার যেন বুঝতে ভুল না হয় যে, ক্ষণিকের "তুচ্ছ" সেই ঘটনার নায়ক ছিলাম আমি। তার অবশ্য সেই সামান্য ঘটনাটি মনে না থাকাই স্বাভাবিক—এইরূপ তুচ্ছ ঘটনা তাঁর জীবনে হয়ত বহু ঘটেছে। কিন্তু এই বাড়ির পটভূমিতে ক্ষণিকের সেই স্মৃতি আমার মন থেকে আজও মুছে যায় নি। আজ ছত্রিশ বছর পরেও লিখতে বসে সেই স্মৃতি আমার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে।

"আমি যদি সেদিন সেই সময়ে একটি নিদারুণ অসহায় অবস্থার মধ্যে না থাকতাম তবে হয়ত সেই সামান্য ঘটনা আমারও সামান্য বলেই মনে হ'ত। প্রায় বারো ঘণ্টা আগে ফেনীতে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ ক'রে এসেছি। নিজেদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, বন্ধুদের কোনো খবর নেই—মন খুবই খারাপ। আবার নিজের নিরাপত্তার জন্য প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় পাগলের অভিনয় ক'রে চলেছি,

অশান্ত, অসংযত বালকদের কৌতুকের সামগ্রী হয়েছি, তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে চাতকের মতো ব্যাকুল দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়াচ্ছি যদি কোথাও একবিন্দু জলের সন্ধান পাই। এমন একটি শোচনীয় অবস্থায়, জীবনের এইরূপ সন্ধিক্ষণে—ওই বাড়ি, ওই জলাশয় আমাকে আকর্ষণ করলো।

"দীঘিতে নেমে প্রচুর জল খেলাম তারপর খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। দুপুর প্রায় দু'টো হবে। এত বড়ো বাড়ি হলে কি হবে লোকজন কাউকে দেখতে পেলাম না। আমার একা একজন লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া প্রয়োজন, যার সঙ্গে কথা বলতে পারি। তারপর তার কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাব, এই ছিল ইচ্ছে। কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়লাম। তখনও কাউকে দেখতে পেলাম না। একটু দূরে দু'একজন বালক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তারা কম্পাউণ্ডের মধ্যেই খেলা করছিল। আমাকে দেখে তারা বেশ উৎসুক হয়ে উঠলো। আমার উদ্‌ভ্রান্ত অর্ধ-উলঙ্গ বেশ কার না কৌতূহল জাগাবে? ছেলেরা আমাকে দেখেই তাদের সমবয়সীদের ডেকে কি যেন বললো। দেখতে দেখতে কোথা থেকে প্রায় পনেরো-ষোলজন বালক ছুটে এলো। আমার তো তাদের দেখেই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। আবার সেই বালকদল! ছুটে পালাবার উপায় নেই। পনেরো-বিশ হাত ব্যবধানে আমার সামনে তারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। দলে তারা ক্রমশই বাড়ছে। তাদের মধ্যে আমাকে নিয়েই হাসি ঠাট্টা হচ্ছিল। কেউ কেউ ভয় দেখাচ্ছিল এবং চোখ-মুখ রাঙিয়ে আমাকে বেরিয়ে যেতেও বলছিল। তবুও বলতে হবে এরা অনেক শান্ত, অনেক ভদ্র—তখনও ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করে নি।......

"ছোট্ট মেয়ের কচিকণ্ঠে যখন অকস্মাৎ ধ্বনিত হ'ল, 'কেন ওকে বিরক্ত করছিস্—তোদের একটুও দয়া মায়া নেই—' আমি ক্ষণিকের জন্য অভিভূত হলাম। কে এই বালিকা? এইটুকু দয়া, এই সামান্য

সহানুভূতিটুকুর জন্যই প্রায় বারো ঘণ্টা ধরে, সহস্র দুর্বিপাকের মধ্যেও, আকুল প্রতীক্ষায় ছিলাম। কোথাও কোনো ভরসা পাই নি। কারো কাছে কোনো সাহায্যের আশাও ছিল না, লোক দেখলেই আগে-ভাগে সরে গেছি, কারো কাছে বলতে গিয়েও বলা হয় নি—অনেকেই সন্দেহ করেছে, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, বালকদের কাছেও তাড়া খেয়েছি—ওরা মনের সাধে কটুকথা বলেছে, ঢিল ছুঁড়েছে। তারপর বড়ো বাড়ি ও মন্দির দেখে খুব আশা নিয়ে এগিয়েছি যদি একটু আশ্রয় পাওয়া যায়! মারমুখো ছেলেদের উত্তেজনা ও তাদের কিল ঘুষির মহড়া দেখে যখন এই সব অর্বাচীনদের প্রতি শত অভিযোগ নিয়ে অভিমানভরে চলে যাচ্ছি, তখন সেই করুণামাখা কণ্ঠস্বর আমাকে চমকিত—বিচলিত করলো। কে এই সহানুভূতিশীলা বালিকা? কে এই বালিকা, যার হৃদয় আমার দুঃস্থ অসহায় অবস্থা দেখে বিচলিত হয়েছে? আমার চোখ দু'টি চঞ্চল হয়ে উঠলো—সেই বালকদের ভিড়ের মধ্যে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম কোথায় সেই বালিকা?"

মিহির এইটুকু পড়ার পর বোনটিকে জিজ্ঞাসা করল—"দিদি, আপনার এসব কিছু মনে পড়ছে কি?" ঊষারাণী বলল সবটাই তার আবছা আবছা মনে আছে। আমি বললাম—আমারও কি ছাই মনে থাকত যদি না ঐরূপ একটি সন্ধিক্ষণে ও বিশেষ পটভূমি পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমাদের বাড়ি না যেতাম? ঊষা তার সরল স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ব'লে উঠল—"যদি একবার জানতাম. —যদি আপনিও একটুখানি নিজের পরিচয় দিতেন, তবে নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমার বাবা-মা আপনাকে কোনো মতেই ছেড়ে দিতেন না। আপনি অন্তত সুস্থ হওয়া পর্যন্ত নিশ্চয়ই তাঁরা আপনাকে আমাদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিতেন। আপনি আমাকে অন্তত একটু আপনার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারতেন।" আজকের এই সাক্ষাৎকারে ঊষার এইরূপ মানবতার অভিব্যক্তি আমার খুবই ভালো

লাগলো, তবে আমার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেই দিন সেই পরিস্থিতিতে কোনো মতেই যে আত্মপ্রকাশ করা আমার পক্ষে উচিত হ'ত না, সে কথা তাকে বললাম। মিহির আরও যুক্তি দিয়ে শ্রীমতী উষাকে বুঝিয়ে বলতে লাগল: "দিদি, তখন আপনি বালিকা মাত্র। আপনাকে বিশ্বাস করতে দাদার হয়ত মোটেই আপত্তি ছিল না। কিন্তু একটি ছোট মেয়ের বাড়ির অভিভাবকদের ওপর কিইবা প্রভাব থাকতে পারে। সব জেনেশুনে এবং দাদার প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার পর, তাঁরা হয়ত দাদার উপস্থিতি একেবারে পছন্দ নাও করতে পারতেন, আর সে রকম একটা অবস্থা সৃষ্টির আশংকা করাই দাদার পক্ষে হয়ত তখন খুবই স্বাভাবিক ছিল। তবে দাদা যে আপনাকে সব খুলে বলতে পারলে খুবই খুশী হতেন তা দাদার এই-টুকু লেখা পড়লেই বোঝা যায়।" একথা বলে মিহির আবার আমার বইয়ের পাতা উল্টে পড়তে শুরু করল:

"এখন আমায় যেতে হবে। যাওয়ার আগে সেই মেয়েটির কাছে বিদায় নেবার ইচ্ছে ছিল। এমন কি সম্ভব হলে, আমার পরিচয়টুকু দিতে পারলে ভালো লাগত। কিন্তু কিছুই না বলে চলে আসতে হল। না ব'লে চলে আসার বেদনা অনুভব করছিলাম। বালকদল দীঘির পাড় ধরে কিছুটা পথ আমাকে অনুসরণ ক'রে এলো। আমি শেষ বারের মতো ফিরে তাকালাম। মেয়েটি তখনও বালকদের সঙ্গে ছিল। আমি মেয়েটির ক্ষণিক আতিথ্যের এই স্মৃতিটুকু নিয়েই বিদায় নিলাম।"

উষা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমি কি শেষ পর্যন্ত বিলোনিয়া গিয়েছিলাম? আমি ছোট ক'রে উত্তর দিলাম: "হ্যাঁ গিয়েছিলাম।" তারপর সঙ্গে সঙ্গে আমার অনেক কথাই মনে পড়তে লাগল। তাদের বাড়ি ছেড়ে আমি আবার মাঠ-ঘাট, নদী-নালার পথই নিলাম। কোন্ দিকে চলেছি তা বুঝতে পারলাম না, কারণ দিকনির্ণয় করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। বিলোনিয়ায় যাচ্ছি, না ঘুরে ফিরে আবার ফেণী

স্টেশনের কাছাকাছি কোনো জায়গায় উপস্থিত হব—কে জানে? সব সময় রেললাইনের ওপর দৃষ্টি রাখতে পারছিলাম না। এক সময় রেল লাইন আমার দৃষ্টির অগোচরে চলে গেল। এইভাবে আমি লক্ষ্য হারিয়েছি; তবে উদ্দেশ্য আমার ঠিক ছিল। আমি চাইছিলাম আমাকে যেন লোকের মধ্যে গিয়ে না পড়তে হয়। আমার প্রয়োজন একেবারে একা একজনকে। আর যদি একান্তে কোনো একজনকে পেয়ে তাকে নির্ভরশীল ব'লে আমার মনে হয়, তা হলে তার কাছে আমার ফেরারী অবস্থার কথা জানিয়ে সাহায্য চাইব এই ছিল উদ্দেশ্য। সারাটি পথে লোকের সামনে পড়লাম না। দূরে একটি হাট বসেছে ব'লে মনে হল। আমি তক্ষুনি মোড় নিলাম—হাট বা সেই বাজারটিকে অনেক দূরে রেখে মাঠের ওপর দিয়ে ঘোরা পথে চললাম। একেবারে একা পথিক। একটি খালে নৌকার মধ্যে একজন মাঝিকে দেখতে পেলাম। তার কাছে গিয়ে নিজেকে 'স্বদেশী ফেরারী' পরিচয় দিয়ে সাহায্য চাইব ব'লে একবার ভেবেছিলাম, তবে শেষ পর্যন্ত তার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি নি ব'লে তাকে আর বলি নি। কিছু দূর এগিয়ে যাওয়ার পর একজন জেলের সঙ্গে আমার দেখা। একেবারে একা সে। দেখে তাকে সহৃদয় ব'লে মনে হল। পরীক্ষা করার জন্য ক্ষুধার ভান ক'রে তার করুণা আকর্ষণ করলাম। চিনতে ভুল করি নি। তার করুণার আতিশয্যে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। সে তো আমাকে সাদরে ডেকে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। হৈচৈ ক'রে সবাইকে ডেকে বলতে লাগল: "এস, তোমরা দেখে যাও, আমি কাকে এনেছি। এই অতিথিকে নিয়ে এসেছি—চল সবাই অতিথির সেবা করি।'

বড়ো উঠোন, চারিদিকে বিভিন্ন পরিবারের ঘর। ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-বালক-বালিকার দল বেরিয়ে এল। আমাকে বড়ো একটি পিঁড়িতে বসাল। বড়ো কাঁসার থালা ও কয়েকটি বাটি ক'রে বেশ সাজিয়ে খেতে দিল। শেষে একবাটি দুধও দিল। মায়েরাই খাবার পরিবেশন করছিলেন। আমার সেই পাগলের বেশ—একটি মাত্র

কৌপীন সম্বল। কি যে ভীষণ লজ্জা করছিল। নিজেকে একেবারে সম্মোহিত করেছি—প্রাণপণে সবকিছু থেকে নির্বিকার থাকতে চেষ্টা করেছি। নানা জনের নানা কথা কানে আসতে লাগল :

"আহা ! বাছা কতদিন খায় নি ;"

"একেবারে স্কুলের ছেলে ব'লে মনে হয় ;"

"অনেক দিনের পাগল নয়—বেশী দিন বাড়ি ছাড়েনি, দেখছ না—এখনও চুলের ছাঁটটি ঠিক আছে ;"

আর একজন বিজ্ঞের মতো বলল—"আমি তো বাপু অন্য কথা ভাবছি, আমার মনে হয় একজন সি. আই. ডি.।

এই ধরনের আরও অনেক মন্তব্য তারা নিজেদের ভাষায় বলাবলি করছিল। আর আমি রুদ্ধশ্বাসে সবই শুনছিলাম এবং আমার ভেতরটা চমকে চমকে উঠছিল। এইসব মন্তব্যে যদি আমার মানসিক প্রতি-ক্রিয়ার একটুও বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তা হলে যে হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাব। 'পাগল আমি,' আমার তো সাধারণ বোধশক্তি না থাকারই কথা ! কাজেই কিছু যেন শুনছি না, আর শুনলেও ঐসব মন্তব্যের অর্থ যে আমি বুঝতেই পারছিলাম না, এইরূপ নির্লিপ্তভাব নিয়ে বসে থাকতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলাম। ভাবছি, এতলোকের মধ্যে যত কম সময় থাকা যায়, ততই আমার পক্ষে মঙ্গল, এখন তো তবু কেউ আমাকে সি. আই. ডি. ভাবছে, কে জানে, পরে আবার কেউ আন্দাজ করে বসবে না তো আমি 'স্বদেশী ফেরারী' ? প্রচুর ভাত-ডাল-তরিতরকারী আমাকে খেতে দিয়েছে। এই সব খেতে হলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। ততখানি সময় সেখানে থাকা খুবই আশংকাজনক। তাছাড়া আমি কি করেই বা অতসব খাব ? দু'তিন ঘণ্টা আগে ঊষার বাড়িতে খেয়ে এসেছি। সব খেতে পারি নি ব'লে কিছু ভাত পোঁটলা ক'রে সঙ্গে নিয়েও এসেছি এবং সেই সঙ্গে কুড়িয়ে পাওয়া একটি কাঁচা আমও আমার হাতে ছিল। কলাপাতায় বাঁধা পোঁটলা ও কাঁচা আম আমার পাগল বেশের সঙ্গে

আরও মানিয়েছিল ভালো। আমি জেলে-ভাইটিকে খিদের মিথ্যে অজুহাতে আমার প্রতি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম। আমার আসল প্রয়োজন ছিল একান্তে তাকে আমার ফেরারী জীবনের পরিচয় দিয়ে তার সাহায্য প্রার্থনা করা কিন্তু আমাকে অভুক্ত মনে করে সে তার বাড়ি নিয়ে এল সাধ ক'রে পেটভরে খাওয়াবে ব'লে। কিন্তু এখন এই পরিবেশ থেকে কোনো উপায়ে যতশীঘ্র সম্ভব আমাকে যে মুক্তি পেতেই হবে। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল। আমি তো পাগল, তাই পাগল কখন কি করে বা কি খায়, কি না খায়, তা কি সে জানে? মনের খেয়াল খুশীতে কোনো হিসেব ছাড়াই, যখন যা ইচ্ছে তাই ক'রে বসে। . কাজেই 'পাগল আমি'—আমিও তাই করলাম। কিছু ভাত এদিক-ওদিক ছুড়ে ছুড়ে ফেলেছি। কিছু হয়ত খেয়েছি, দুধে কিছু ভাত চটকালাম, আর তারপর কি যেন খেয়াল হল সেইরূপ ভান করে উদ্‌ভ্রান্তের মতো উঠে পড়লাম। জেলে-ভাইটি ব'লে উঠল—"বস্ বস্। আস্তে আস্তে খা, সবটুকু খেয়ে নে।" 'পাগলের খেয়াল'—তার কথা যেন আমার কানেই গেল না—কিছু যেন বুঝতে পারছিলাম না। এমনি একটি ভান ক'রে হাঁটা দিলাম। দয়ালু ও দরদী জেলে-ভাইটিকে মনে হল খুবই মর্মাহত হয়েছে। তার নিঃস্বার্থ অতিথিসেবা এমনিভাবে অবহেলিত হবে সে ভাবতেই পারে নি। পাগল ব'লেই হয়ত আমার অপরাধ সে নেয় নি—আমাকে ক্ষমা করেছিল।

আমি কোনো কিছু ভ্রূক্ষেপ না করেই পাগলামির ভান ক'রে হাঁটতে শুরু করলাম। দরদী জেলে বন্ধুটি কিছুদূর পর্যন্ত আমার পিছু পিছু এল। "আয় আয়, এদিকে আয়," ব'লে হাত ধরে আমাকে গ্রামের পথটি চিনিয়ে দিল। কিছুক্ষণের জন্য তাকে আবার খুব একান্তে পেয়েছিলাম, এবং মনের কথা প্রায় তাকে ব'লে ফেলেছিলাম আর কি, তবু বলি বলি ক'রে বলাটা শেষ পর্যন্ত হল না। আমি একটু আগেই ঐ অবস্থায় এতগুলো লোককে পরিত্যাগ ক'রে

এসেছি, তাই জেলে-ভাইকে আমার ফেরারী পরিচয় তখনও দেওয়া সমীচীন মনে করলাম না, পাছে আমাকে একজন 'স্বদেশী ফেরারী' জানার পর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, তখন বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাকে আমার প্রতি অনুরাগী ক'রে তোলার সময় হয়ত পাব না। তার চেঁচামেচিতে ইতিমধ্যে হয়ত সেখানে লোকজন জড়ো হয়ে যাবে।

এইসব কথা যখন আমার মনে পড়ছিল, তখন ঊষাকে আমি বুঝিয়ে বললাম যে, তাদের ওখান থেকে চলে আসার সময় আত্ম-পরিচয়টি অন্তত তাকে ব'লে আসার জন্য আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু আশপাশের ঐ সব বালকদের উপস্থিতি আমাকে সেই ইচ্ছা থেকে বিরত করল।

এই জেলে বাড়িটি সঠিক কোন স্থানে, অথবা ফেণী বা বিলোনিয়া থেকে কত দূরে, তার কোনো আন্দাজই আমার ছিল না। তাই তাকে বললাম, তুমি যে এক্ষুনি জিজ্ঞেস করছিলে—আমি বিলোনিয়া গিয়েছিলাম কিনা ? সে সম্বন্ধে সত্যি বলতে কি—বিলোনিয়া যাবার কোনো অভিপ্রায়ই আমার ছিল না। আমার প্রয়োজন কোনো একজন দরদী ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া—হোক না কেন ফেণী, বিলোনিয়া অথবা অন্য কোনো জায়গার লোক। যতক্ষণ সেইরূপ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছিল না, ততক্ষণ পথ অতিক্রম করাই আমার কাছে একেবারে অপরিহার্য মনে হয়েছিল।

আমার আরও মনে পড়তে লাগল—জেলে-ভাইটির বাড়ি ছেড়ে আসার পর যেদিকে মুখ ক'রে হাঁটছিলাম তাতে মনে হচ্ছিল আমার গতি যেন ফেণীর দিকে নয়, সম্ভবত বিলোনিয়া অভিমুখে হবে।

আমি যখন বললাম, 'আমি বিলোনিয়া গিয়েছিলাম', তখন ঊষা আমাকে বলল, সেখান থেকে বিলোনিয়া প্রায় পাঁচ-ছ' মাইল বা আরও কিছু পথ বেশী হবে। তখন আবার সব যেন স্বপ্নের মতো মনে ভেসে উঠতে লাগলো : ঠিক বলতে পারব না কত পথ হেঁটেছি, কারণ সোজা পথ ধরে আমি যাচ্ছিলাম না। যখন জানতে পারলাম

আমি বিলোনিয়া পৌঁছেছি—বিলোনিয়াতেই এক মাঠে বসে আছি, তখন সূর্য উঠেছে, সকাল হয়েছে। সেদিনটি ছিল ২৪শে এপ্রিল, ১৯৩০ সাল। ২২শে এপ্রিল, রাত দু'টোয় ফেণী স্টেশনে রিভলভারের গুলি চালিয়ে তিনজন সশস্ত্র পুলিশকে আহত অবস্থায় ফেলে রেখে তাদের বেষ্টনী ভেদ করেছি। মনে পড়ছিল উষাদের বাড়ি যাই ২৩শে এপ্রিল দুপুর দু'টো বা তিনটের সময়। ২৪শে এপ্রিল আমি যখন একটি মাঠের আলের ওপর বসেছিলাম এবং খুব নিকটেই অকস্মাৎ বিউগলের শব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠেছিলাম ও লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জেনেছিলাম, আগরতলার মহারাজার একটি সৈন্যদল সেখানে শিবির স্থাপন করেছে।

পরপর আরও মনে পড়তে লাগল—জেলেবাড়ি ছেড়েছিলাম বিকেল পাঁচটা নাগাদ, তারপর আমি তিনটি ছোট বড়ো খাল পেরিয়েছি—জল খুব কম ছিল। হেঁটেই পেরিয়েছি দু'টি খাল। তৃতীয়টি সাঁতরে অতিক্রম করতে হয়েছে। সূর্য তখন অস্তাচলের পথে। আমি তখন উত্তরমুখো হয়ে হাঁটছি। দেখতে দেখতে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসছে। দেখে মনে হল অনতিদূরে একটি ভাঙা-হাটের শেষপর্ব চলছে—প্রায় জনশূন্য হয়ে এসেছে। তবু কিছু লোক তখনও বেচাকেনার শেষে নিজ নিজ বাড়ি ফেরার মুখে। ঐরূপে একটি ভাঙা-হাটের সামান্য ভিড়ও আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয় ব'লে মনে করেছি। ভাঙা-হাটের ঐ অবস্থা দেখে আমার গতি ক্রমেই মন্থর করতে হল। ভাবলাম—সামনে আর কোনো মতেই এগনো চলবে না। পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার জন্য গতিপথ পরিবর্তন করতে হল। এখন সত্যই সন্ধ্যার ছায়া বেশ নেমেছে। একটি দোকানে দেখলাম হ্যাজাক-লাইট জ্বলছে। আমি দ্রুত পথ চলতে লাগলাম। তা সত্ত্বেও দু'একজনের দৃষ্টি আমি এড়াতে পারলাম না। তারা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করতে করতে চলছিল আর আমাকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিল। তাদের দৃষ্টির অগোচরে চলে যাবার জন্য

আমি একটু মোড় নিয়ে গ্রামের অভ্যন্তরের পথ ধরলাম। তারা ঔৎসুক্যের বশে আর যে অনুসরণ করে নি তাই আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। সন্ধ্যার আরও কালো অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। হঠাৎ দেখলাম নিজের অজান্তে ঢুকে পড়েছি একটি গ্রাম্য পাড়ার মধ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রামের গলি পথটি শেষ হয়ে গেল—সামনে দেখি কোনো এক গ্রাম্য পরিবারের পাকা বাড়ি আমার পথ রুদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। আমি অমনি একেবারে উল্টো দিকে মুখ ক'রে হেঁটে ঐরূপ বদ্ধস্থান থেকে বেরিয়ে মাঠের পথ ধরতে চাইছিলাম। যখন উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করেছি, তখন একজন পাশের একটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখেই চমকে উঠল। খুব আশ্চর্য হয়ে আপন মনে অথচ জোরে জোরে ব'লে উঠল—"একি! কেরে বাবা!" তার মুখের কথা মুখেই রইল, আমি নিঃশব্দে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে একটুখানি মাঠ অতিক্রম ক'রে একটি রেললাইনের পাশে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমার সামনে উঁচু রেল-পথের ওপর দিয়ে দু'দিকে রেললাইন চলে গেছে। আমি নিচু জমি থেকে ধাপে ধাপে পা ফেলে লাইনের ওপর উঠলাম। চারিদিকে তাকাতে লাগলাম—যদি কিছু আন্দাজ করতে পারি কোথায় এসেছি। সেরূপ কোনো নিদর্শনই চোখে পড়ল না। আরও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, অন্তত ভরসা করার মতো যদি একটি বিশেষ লোকালয় বা তেমন কোনো বাড়ির অস্তিত্ব কোথাও দেখা যায়। কিন্তু, কি ক'রে দেখব। সব দিকেই অন্ধকার—কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না—সামনে বা দূরে কোনো পাহাড় বা টিলার অস্তিত্ব আছে কিনা তাও অনুমান করা সম্ভব ছিল না। এখন এই রাত্রে কোথায় যাব। এই রাত্রে কারো বাড়ি যাওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। হঠাৎ আমাকে এই বেশে যারাই দেখবে, তারাই হয়ত লাঠি নিয়ে তাড়া করবে। এখান থেকে বেশ দূরে লাইনের ধারে দেখতে পেলাম কারা যেন আগুন জ্বালিয়ে কি করছে। সেখানে

কয়েকজনকে খাকী পোশাকে দেখতে পেলাম। মনে হল তারা পুলিশ বা সৈনিক—নিজেদের ঘাঁটিতে কাজকর্ম করছে। আমি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। রেললাইন থেকে নিচে নামলাম। রেললাইনটি অতিক্রম ক'রে ও-পারের সামনের মাঠ ধরে কিছুটা এগোলাম। শেয়াল ডাকছে, শুনতে পাচ্ছি। বাঘ হয়ত নেই। নাকি বাঘের আগমনবার্তা একযোগে ঘোষণা করছে? চারিদিকে অন্ধকার, এত ঘন যে কোথায় কি আছে বোঝা যাচ্ছিল না। ঐরূপ অবস্থায় ও অজানা-অচেনা জায়গায় পা ফেলে চলা খুবই আশংকাজনক ব্যাপার। নালা-ডোবা, কাঁটা, সাপ-ব্যাঙ, ঝোপ-ঝাড় প্রভৃতির অস্তিত্ব বোঝা সম্ভব নয়। প্রতি পদে পদে সবরকম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। গ্রামের লোকেরাও তাদের সুপরিচিত জায়গায় সেই অন্ধকারে নিশ্চিতভাবে হাঁটতে পারছিল না বলেই মনে হয়। বেশ দূরে দেখলাম জনাতিনেক লোক পাটকাঠি জ্বালিয়ে পথ আলো ক'রে একটি পাহাড়ের পাদদেশ ঘেঁষে কোথায় যেন যাচ্ছে। ক্ষণিকের মশালের আলোতে বুঝতে পারলাম প্রায় তিনশ' গজ দূরে একটি পাহাড় আছে। আমি তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম আর দেখছিলাম মশালের আলোতে দূরের পথ, কিন্তু আমার চারপাশের অবস্থা কিরূপ, তা দেখতে অথবা বুঝতে পারছিলাম না।

আমি খুবই ক্লান্ত ও শ্রান্ত। শারীরিক শ্রান্তির থেকেও মানসিক অবসন্নতার প্রভাব অনেক বেশী অনুভব করছিলাম। ফেনী স্টেশনে গুলি চালাবার পর যখন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি তখন চোখে দেখতে না পেয়ে কাটাতারের বেড়ার ওপর গিয়ে পড়ি। কাঁটার আঁচড়ে গা-হাত-পা তিন-চার জায়গায় কেটে-ছড়ে গেছে। তাছাড়া মাথার ওপরের ক্ষতটিও বেশ গভীর। অনেক রক্ত ঝরেছিল। সেই রক্তচিহ্ন আমাকে সযত্নে মুছে ফেলতে হয়েছে। আর মাথার ক্ষত স্থানটি সবসময় ঢেকে রাখতে হয়েছে চুল দিয়ে। এইসব সামান্য সামান্য ক্ষতস্থানে ব্যথা অনুভব করছিলাম। সব থেকে বেশী কষ্ট

দিচ্ছিল পায়ের তলার ছু'-তিন জায়গার ক্ষতস্থানগুলো। আর বেশ কয়েকটি ছোট ছোট কাঁটা বিঁধে আছে পায়ের তলায়। বড়ো কাঁটাগুলো টেনে বার ক'রে ফেলা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু ছোট ছোট কাঁটাগুলো যেন পায়ের তলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ক'রে বসে আছে। তাদের উৎখাত করা একমাত্র ভালো পরিবেশ ও অন্যের সাহায্যেই সম্ভব। পায়ের পাতা মাটিতে ফেলে হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। অন্ধকারেও কিছু দেখা যাচ্ছে না, আর যেন হাঁটতেও পারছিলাম না। শরীরও যেন বিশ্রামের জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। ঠিক করলাম আর হাঁটব না। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি মনে হল সেটা আল দিয়ে ঘেরা মাত্র কাঠাখানেক জমি হবে। মাটি শুকনো, কিন্তু মনে হল, মাটি যেন কেউ লাঙ্গল দিয়ে চষে রেখেছে। আলের গা ঘেঁষে একটি ছোট গাছ। সেটি কি গাছ তা আমার পক্ষে বলা মুশকিল। তবু মনে হয়েছিল বোধহয় এটি হবে একটি আম গাছ।

আমি ঐ গাছের তলায় বসে পড়লাম। এপ্রিল মাস। শীত থাকার কথা নয়, তবুও আমার শীত শীত করছিল। একেবারে খালি গায়ে আছি। খাল পেরোবার সময় তিন-চার বার জলে ভিজেছি। রাত্রে দিনের উত্তাপ নেই, ফাঁকা মাঠ, বাতাস বইছে, তাই বোধহয় শীত শীত ভাব। খোঁড়া জমির মাটি ছু'হাত দিয়ে সরিয়ে আমার শোয়ার জন্য একটি গর্ত করলাম—অবশ্য গভীরতা তার সামান্যই ছিল। আমি নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সেই গর্তে রাত কাটাবার জন্য শুয়ে পড়লাম। মাথার নিচে বড়ো বড়ো মাটির চাকা সাজিয়ে বালিশের অভাবটা দূর করি। শীতভাব কমাবার জন্য কতগুলো মাটির ঢেলা দিয়ে শরীরকে ঢাকবার চেষ্টা করেছি। তবে অনেক সময় মনে উঠেছে—চিন্তিতও হয়েছি পোকামাকড়, পিঁপড়ে, সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতির কথা ভেবে। তবে সাপই হল সব থেকে বড়ো প্রশ্ন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র নায়ক ডাক্তারের কথা। ডাক্তার ভারতীকে বললেন—'না, ও

কিছু নয়, একটি সাপ।' ভারতী ভয়ে ও চিন্তায় একেবারে কাতর হয়ে পড়েছে। ডাক্তার ভারতীকে আবার বললেন—"সাপ হলে কি হবে, ওরা আমাদের দেশের, বিদেশ থেকে আমদানি হয়ে আসে নি। আমাদের সাপেরও ধর্মজ্ঞান আছে।" হ্যাঁ, সত্যি সাপেরও ধর্মজ্ঞান আছে—ভাবলাম তারাও নিশ্চয়ই আমার নিষ্ঠা ও স্বদেশপ্রেমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকের মতো বিশ্বাসহন্তা হতে পারবে না।

মনে মনে ভাবলাম এখান থেকে আর উঠছি না। কাল সকালে প্রথমেই যে কৃষক এই মাঠে কাজ করতে আসবে তাকেই সব খুলে বলব। তাকে বলব আমি একজন 'স্বদেশী-ফেরারী'—তার সাহায্য-প্রার্থী। উদ্ভট চিন্তা! এই নিবিড় নীরব অন্ধকার রাতে এই জনমানবহীন নির্জন শান্ত পরিবেশে, মাটির ওপর শুয়ে মনের মধ্যে ভেসে উঠছিল ঘটনাবলীর একের পর এক দৃশ্য। ১৮ই এপ্রিল যুব-অভ্যুত্থান—গর্জন করে উঠল আমাদের হাতের রিভলভার-পিস্তল, ব্রিটিশ-শাসিত চট্টগ্রাম শহর আমরা অধিকার করেছি। দুইবার শত্রুর মেশিনগান আক্রমণ ব্যর্থ করলাম, বড়ো বড়ো দুটি অস্ত্রাগার ধ্বংস করেছি—পুড়িয়ে ছাই করেছি। আগেই টেলিফোন গৃহ ভস্মসাৎ হয়েছে। তিনজন অস্ত্রাগারের রক্ষী আমাদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে, সার্জেণ্ট মেজর ফেরলকেও মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে, ক্যাপটেন টেট-কে অন্যান্য সাহেবদের সঙ্গে পালিয়ে বাঁচতে হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেটের মোটরগাড়ি অবরুদ্ধ হয়েছে, তার দেহ-রক্ষী গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছে, ড্রাইভার আহত, ম্যাজিস্ট্রেট জীবন নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছেন। শহরের প্রধান প্রধান অস্ত্রাগার দু'টিতে আগুন দিলাম, দাউদাউ ক'রে জ্বলতে লাগল, হিমাংশু আগুনে দগ্ধ হল, আমি আর আমার সঙ্গে তিনজন গাড়িতে হিমাংশুকে নিয়ে শহরে এলাম, আমাদের প্রধান বাহিনী পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শহরে না এসে পাহাড় অঞ্চলে যাওয়াই শ্রেয় মনে করল।

এপ্রিল মাসের ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ তারিখ বিকাল পর্যন্ত শহরে

বহু বিপদ ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি—পুলিশের নাকের ডগা থেকে উধাও হয়েছি; তারপর ফেণী স্টেশনে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ ক'রে আমরা নিজেরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। মনে পড়তে লাগল বালকদের উৎপাতের কথা, মনে পড়ল ঊষাদের বাড়িতে আমার প্রতি সেই বালিকার আতিথেয়তার কথা—বালিকা ঊষার কথা ও আমার জেলে-ভাইটির কথা আমি ভুলতে পারছিলাম না, আর মনে হতে লাগল প্রধান বাহিনীর প্রতিটি বিপ্লবী সৈনিকের কথা—কে কেমন আছে! আর আমার তিনজন সাথী কোথায় আছে কি করছে? ধরা পড়ে নি তো? আবার ভাবতে লাগলাম সেই ধুম ও লাঙ্গলকোট স্টেশনের কথা যেখানে আমাদের আরও দু'টি ছোট ছোট গেরিলা দল মালগাড়ি লাইনচ্যুত ক'রে ট্রেন চলাচলের পথ বন্ধ করার জন্য গিয়েছে—তারা সফল হয়েছে কি? মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়েছে তো?

এসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমের মধ্যে অনেক স্বপ্ন দেখেছি। বইতে তা লিখেছি। এখানে আর সেই স্বপ্নের কথা বলার ইচ্ছা নেই। তবে সেই স্বপ্নের কথা এই বৈঠকেও আমার মনে পড়ছে। যা হোক তা এখানে বলা না হলেও মূল বিষয়বস্তুর বিশেষ কোনো ব্যতিক্রমের আশংকা নেই।

আমার ঘুম ভাঙল। ভোর একেবারে আসন্ন প্রায়—তার কিছু কিছু আগমনবার্তার ইঙ্গিতও পাচ্ছি। দু'একটি পাখির ডাক কানে আসছে। অনেক দূরে লোকজন জেগেছে ব'লে মনে হল। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরোপুরি ভোর হবে। এখন কিছু কিছু আশেপাশের অবস্থা দেখতে পাচ্ছি, কি করব—কোনো এক অজানা লোকের প্রতীক্ষায় কি শুয়েই থাকব, নাকি বুদ্ধি বিবেচনার ওপর নির্ভর ক'রে দরদী বন্ধুর সন্ধানে প্রচেষ্টা চালাব? নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থেকে তারপর অদৃষ্টকে দোষারোপ করার মধ্যে ক্লীবত্বের সার্থকতা থাকতে পারে, কিন্তু কর্মযোগীর পুরুষকার তাতে লাঞ্ছিত ও চিরতরে ধুলোয় লুণ্ঠিত হবে।

হাত পা সব যেন একেবারে জমে গেছে। সারা শরীরটাই অচল হয়ে পড়েছে। সারাটি দেহ আরাম পাওয়ার জন্য যেন একেবারে কাঙাল। সমস্ত শরীরে নিদারুণ ব্যথা, উঠে বসতেও ইচ্ছে করছিল না। জরাজীর্ণ মনের বিরুদ্ধে পুরুষকার তার বক্র হাসিতে আমাকে যেন বিদ্রূপ ক'রে উঠল। নিশ্চেষ্ট হয়ে অদৃষ্টকে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে হবে এক অমার্জনীয় অপরাধ। শত শারীরিক ব্যথা, মানবদেহের অজস্র কষ্ট, আমার সাময়িক শারীরিক অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমাকে দুর্জয় শক্তি নিয়ে আরও অনেক বুদ্ধি বিবেচনা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে কোনো এক ক্ষণিকের বন্ধুর সন্ধান পাওয়ার জন্য।

আমি ধীরে ধীরে উঠলাম। পা ফেলে হাঁটা যেন আর যাচ্ছিল না, তবু যেতেই হবে। বহু কষ্টে একপা একপা ক'রে এগোতে লাগলাম। আসন্ন দিবালোকের আলোতে আবছা আবছা দেখে মনে হল জমিটির আলের ধার দিয়ে যেন একটি গ্রাম্য পথ চলে গেছে। দশ পনের পা হাঁটার পর পদক্ষেপ যেন কিছুটা সহজ হয়ে এল। আমি গ্রাম্য পথটি ধরে এগিয়ে যাব ঠিক করলাম। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দেখলাম লাঙ্গল কাঁধে জনৈক চাষী তার গরু নিয়ে আমার পাশ কাটিয়ে মাঠে যাচ্ছে। তার চোখমুখ ভালো ক'রে দেখতে পেলাম না, তাই একলা পেয়েও তাকে কিছু বলব কিনা, তা ঠিক ক'রে ওঠা গেল না। প্রায় দু'দিন আমি মুখ বন্ধ ক'রে আছি— কেবলই বোবার অভিনয় ক'রে এসেছি। কিন্তু এখন কারো কারো সঙ্গে আমার কথা যে বলতেই হবে। আমার কণ্ঠস্বর ঠিক আছে কিনা সেটা পরীক্ষার জন্য নিজে নিজেই কথা ব'লে দেখলাম। আর একটু দূরে এগোনর পর অন্য একজন কৃষককে আমার বাঁ পাশ দিয়ে গরু ও লাঙ্গল নিয়ে যেতে দেখলাম। খুব ভালো ক'রে তার চেহারা দেখা না গেলেও যেটুকু দেখতে পেলাম, তাতে আমার মনের কথা বলার জন্য ভরসা করতে পারলাম না। যে পথ দিয়ে হাঁটছিলাম সেটি আর একটি গ্রাম্য পথের সাথে গিয়ে মিশেছে। আমি ঐ

মাড়ে এসে বাঁ দিকের রাস্তাটি ধরে চলতে লাগলাম। আমার গতি খুবই মন্থর। ডান দিকের রাস্তা যেটা ফেলে এসেছি, দেখি সেই পথে একজন চাষী একজোড়া গরু নিয়ে লাঙ্গল কাঁধে আমার পেছনে পেছনে আসছিল। আমি একটু পাশে সরে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। তাকে পথ ক'রে দিলাম। সে যখন আমাকে অতিক্রম করবে তার আগে থেকেই তার চেহারাটি দেখার জন্য চেষ্টা করছিলাম। প্রভাতের আলো তখনও যথেষ্ট পরিষ্কার হয় নি, তাই খুব ভালো দেখা যাচ্ছিল না। তবু যেটুকু তার মুখচোখ দেখেছি, তা থেকে অনুমান করলাম, আমার মতোই তার বয়স—আর না হয় দু'এক বছরের বেশী হবে। তাকে হিন্দু ব'লেই মনে হল। অবশ্য হিন্দু বা মুসলমান তার ওপর আমার দরদী বন্ধু নির্বাচন নির্ভর করছিল না।

প্রায় সাত বছর আগের কথা। নাগারখানা গিরিশৃঙ্গে ও পর্বতের কন্দরে কন্দরে যখন আমাদের যুদ্ধ চলছিল ও জেলার সর্বপ্রধান পুলিশ লাইনের গোটা সশস্ত্র বাহিনী আমাদের পাহাড়টি ঘিরে ফেলেছে, তখন এক মুসলমান রাখাল আমাদের তিনজনকে তাদের সুদৃঢ় বেষ্টনী থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যায়। তাই মানুষের ধর্মবিশ্বাস আমার বিবেচনায় বড়ো নয়—মানুষটি খাঁটি কিনা সেটাই ছিল আমার বিচার্য বিষয়।

এইটুকু সামান্য দেখে, যাকে বলে প্রথম দৃষ্টিতেই আমার মনে হল তার ওপর নির্ভর করা চলে। ভুল হবে কি হবে না সেই দ্বিধা নিয়ে ইতস্তত করার সময় ছিল না। আমার গতি ধীরে, আর সে হাঁটছিল আমার চাইতে অনেক দ্রুত। আমাকে ফেলে সে একটু-খানি এগিয়ে গেল। প্রায় দু'দিন পরে এই প্রথম মুখ খুললাম; ডেকে বললাম: "ভাই একটু দাঁড়ান, আমার কথা একটু শুনুন।" সে গ্রাম্য ভাষায় আমাকে বলল তার দাঁড়াবার সময় নেই, গরু চলে যাচ্ছে। আমি একটু দ্রুত হাঁটতে চেষ্টা করলাম আর অনুনয় ক'রে বললাম, আমি খুব বিপদে আছি, ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি।

অনেক খুন করেছি। আমি একজন 'স্বদেশী-ফেরারী'। সে আমার কথা শুনে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়েই আমাকে একরকম রুষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করল—খুন কেন করলে। এক কথায় তাকে কি উত্তর দেব। সেও হাঁটছে, আমিও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হেঁটে চলেছি এবং সেই চলা কালেই বললাম: "ভাই সে অনেক কথা। সবই আপনাকে বলব। এখন আমার বড়ো বিপদ। বিপদে পড়েই আপনার সাহায্য চাইছি, আমাকে ভাই আপনি দয়া করুন।" তার রুষ্টস্বর শুনে প্রথম মনে হয়েছিল, কি জানি নির্বাচনে আমি ভুল করি নি তো? এখন আমার অনুনয় শুনে মনে হল সে আমার প্রতি যেন সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছে। সে আমাকে বলল তাকে যেন আমি অনুসরণ করি। সে মাঠে যাচ্ছে, সেখানেই সে আমার কথা শুনবে। তাকে অনুসরণ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিল না। এই সময় তাকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য আমার সঙ্গে যে মাত্র ত্রিশ টাকার একটি ছোট প্যাকেট ছিল তা দিলাম, এবং দিয়ে বললাম, আমার সর্বস্বই এতে আছে। আর মিনতি জানিয়ে বললাম কেউ দেখার আগেই যতশীঘ্র পারে আমাকে তার ঘরে যেন একটু গোপন আশ্রয় দেয়। সেই সাথে এও বোঝালাম যে, তা না হলে আমারও যেমন বিপদ তারও তেমনি বিপদ।

আমি যতখানি ব্যস্ত হয়েছি, তাকে দেখলাম, সে যেন ততখানি নির্বিকার। এতক্ষণে সে তার গরু ও লাঙ্গল নিয়ে নিজের জমিতে নেমে পড়ল এবং আমাকে জানাল আমি যেন আলের ওপরে বসি। আবার তাকে অনুরোধ করলাম, আমাকে যেন সে যতশীঘ্র পারে আশ্রয় স্থলে রেখে আসে। সে তবুও আমাকে জানাল আর একজন কাজের লোক না আসা পর্যন্ত সে যেতে পারছে না—আমি যেন ততক্ষণে মাঠে বসি। সে তার জমি চষা আরম্ভ করল। ততক্ষণে সূর্য উঠেছে। এই সময়ে অনতিদূরে শুনতে পেয়েছিলাম বিউগলের শব্দ—যে কথা উষার সাক্ষাতের সময় বলা হয় নি, এবং আগে যে লিখেছি

'একজনের' কাছ থেকে জেনেছিলাম—আগরতলার মহারাজার সৈন্য সেখানে গতকাল থেকে শিবির স্থাপন করেছে, সে হল এই কৃষকটি।

উষার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মনে পড়ছিল—সেই মাঠে ঐভাবে প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। আমিও খুবই বিচলিত ও অস্থির হয়ে পড়েছি। আবার তাকে অনুরোধ জানালাম সে যেন আগেভাগে আমাকে নিয়ে গিয়ে তার গৃহে লুকিয়ে রাখে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে একজনকে ডেকে তার গরু সামলাতে বলে আমাকে তার সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হল।

তাকে অনুসরণ করলাম। সিকি মাইল যাওয়ার পর একটি ছোট পুকুরের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছি। সে আমাকে স্নান ক'রে নিতে বলল। আমি আগেই তো বলেছি আমি প্রায় উলঙ্গ ছিলাম, আমার পরিধানে ছিল মাত্র একটি কৌপীন। সারা গায়ে কাদামাটি, তাছাড়া এত ঘোরাঘুরির পর স্নান করার উপদেশটি পালন করা আমার পক্ষে অনেক ভালো হবে মনে ক'রে, আমি পুকুরে নেমে পড়লাম। জল পরিষ্কার ছিল। মনে হল এই পুকুরের জলই সেই গ্রামের লোকেরা পান করে। আমার স্পষ্ট মনে আছে পুকুরটিতে কাদা ছিল না, ছিল বালি। একটুখানি স্নান ক'রেই তাকে আবার অনুসরণ করতে লাগলাম। খুব নিকটেই একটি বাড়ি। সেই বাড়িটি তারই হবে বলে মনে হল। সে আমাকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে একপাশে ঢেঁকি ঘরের দিকে গেল। যে ঘরে ঢেঁকি আছে সেই ঘরের পাশে আর একটি ছোট ঘর—যার উচ্চতা খুবই কম, সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। এই ঘরটি ছিল লেপাপোঁছা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এক কোণে কিছু হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি রাখা ছিল। আমাকে ঐ ঘরের মধ্যে গিয়ে বিশ্রাম করতে বলল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে আমাকে একটি জামা ও একটি ধুতি দিয়ে গেল, আর বলে গেল রাত্রে এসে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলবে।

সে চলে গেল। আমার রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না, ভাবছিলাম কোনো আশংকার কারণ আছে কিনা ? মনে হল সে অন্তত সজ্ঞানে আমার অনিষ্ট করবে না। আপন মনে বসে আছি প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেল, এমন সময়, একটি বাটি ক'রে একজন মহিলা আমাকে চিঁড়েগুড় দিয়ে গেল। সেইসঙ্গে গেলাসে জলও দিয়ে গিয়েছিল। আমি তার দিকে তাকাই নি, তাই বলতে পারব না তার বয়স কত ছিল। জানিনা তিনি কৃষক-ভাইটির মা, বোন, স্ত্রী কে ছিলেন। আর আমি এও জানি না যে কৃষক-ভাইটি বিবাহিত না অবিবাহিত। কৃষক-ভাইটির নাম সুরেন, পদবী আমার মনে নেই।

দুপুরে সেই পরিবারের জনৈকা মহিলা আমাকে ভাত ডাল ইত্যাদি দিয়ে গেলেন। সন্ধ্যে আটটা নাগাদ সুরেন আমার কাছে এল। তার সঙ্গে আমি পরামর্শ করলাম, সে যেন বিলোনিয়া থেকে আমাকে প্রথমে চৌদ্দগ্রামে এবং তারপর বাস-সার্ভিসের বাসে ক'রে কুমিল্লা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। যদি কুমিল্লা গিয়ে পৌঁছতে পারি, তা হলে তাকে আমি যে বাড়িতে যাব সে বাড়ি থেকে দু'শ' টাকা নিয়ে দেব। আদ্যপ্রান্ত সবশুনে সে রাজি হল বটে, কিন্তু জানাল যে, অন্তত তিন দিন পরে সে যাবে। খুব ভোরে উঠে আমাদের রওনা দিতে হবে —তাও সে বলল।

আমি সেই বাড়ির সেই ঘরেই তিনদিন অতিবাহিত করার পর এক সুপ্রভাতে তার সঙ্গে চৌদ্দগ্রাম যাওয়ার জন্য রওনা হলাম। আমার পরনে হাঁটু পর্যন্ত একটি ধুতি, গায়ে একটি শার্ট আর হাতে একটি ছাতা। আমি এখন আর আগের মতো একেবারে বোবাও নই আবার পুরোপুরি কালাও নই। প্রয়োজনে কিছু কিছু শুনতে পাই আর আধো-আধোভাবে কথার উত্তরও দিই। সুরেনকে বললাম পথে কারো সঙ্গে আমার কথা না বলাই ভালো—সে-ই যেন কথা বলে। সে এর কারণ নিশ্চয়ই বুঝেছিল যে আমার কথার টানে

আমি ধরা পড়ে যাব, আমি সেই অঞ্চলের লোক নই। সে আমার পরামর্শ মেনে নিল।

বিলোনিয়া থেকে চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত পাহাড় কেটে প্রায় মাইল চোদ্দ একটি মোটরগাড়ি চলার মতো কাঁচা রাস্তা আগরতলার রাজার ইচ্ছায় সদ্য নির্মিত হয়েছে। এই পাহাড়ের মধ্যদিয়ে উঁচু-নিচু রাস্তা ধরে আমরা চৌদ্দগ্রাম অভিমুখে চলেছি এবং প্রায় সকাল দশটার সময় বিলোনিয়া চৌদ্দগ্রাম সীমান্তের ফাঁড়িতে এসে উপস্থিত হলাম। যথারীতি আমাদের ফাঁড়িতে যেতে হল এবং সেখানে তারা আমাদের মামুলি জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ছেড়ে দিল। সুরেন ভাই যথাযথ উত্তর দিয়ে তাদের খুশী করল। চৌদ্দগ্রামে সুরেনের আত্মীয়-স্বজনেরা থাকে। সে চৌদ্দগ্রামের বাজারে একটি কামারশালায় গিয়ে উপস্থিত হল। সেই কামারটি ছিল সুরেনের আত্মীয়। সে সুরেনকে দেখেই খুব আনন্দের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানায় এবং সুরেনকে তার বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সুরেন অগত্যা রাজি হয়ে তার সঙ্গে চলে গেল এবং যাওয়ার সময় আমাকে বসতে বলে গেল। আমি সেই কামারশালায় চুপচাপ বসে রইলাম। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে তারা দুজনে আবার ফিরে এল। সুরেন আমাকে জানাল যে, তার শরীর খুব খারাপ লাগছে, কুমিল্লা পর্যন্ত সে যেতে পারবে না। আমাকে একাই যেতে হবে। আরও জানাল আজ বাস কখন যে ছাড়বে বা আদৌ বাস ছাড়বে কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, কেননা বাসের স্প্রিংটি গেছে ভেঙে। জানা গেল বাসটি কোনো যাত্রী না নিয়েই ধীরে ধীরে কুমিল্লা যাবে। অথচ কুমিল্লা সেখান থেকে বারো-চোদ্দ মাইলের পথ। তারা চেষ্টা করে দেখতে গেল একজন যাত্রীকেও বাসটি নেবে কিনা। তারপর তারা তাদের রাজি করিয়ে এসে আমাকে বলল বাসে গিয়ে উঠতে এবং তারাও আমাকে বাসে উঠিয়ে দেবার জন্য আমার সঙ্গে এল। আমি সুরেনের সঙ্গে কোনো কথা বলারই সুযোগ পাচ্ছিলাম না, কারণ তার আত্মীয়টি সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গেই

ছিল। আমার বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয় নি যে সুরেনের কাছ থেকে সেই আত্মীয়টি আমার সম্বন্ধে সব কিছুই জেনেছে এবং তারই পরামর্শে সুরেন অসুস্থতার অজুহাতে আমার সঙ্গে যেতে আর সাহস করছে না। তাদের কথা মতো আমি বাসে উঠে বসলাম। সুরেনকে কোনো মতে একটু বললাম আমার কাছে তো টাকা-পয়সা কিছুই নেই, সবই তাকে দিয়েছি, সে যেন আমার বাসের ভাড়াটা অন্তত দিয়ে দেয়। কিন্তু সে তাও দিল না, কেবল একটি সিকি আমার হাতে ধরিয়ে দিল। বাস চলেছে, আমি মুখ বুজে বসে আছি। একটি কথাও বলছি না। ভাবছিলাম যখন কুমিল্লা শহরের উপকণ্ঠ অতিক্রম ক'রে শহরে ঢুকবো, তখন আমার অবস্থা জানিয়ে বাস চালককে বলব কাঁধির পাড়ে প্রখ্যাত উকিল কামিনীবাবুর বাড়িতে সে যেন আমাকে পৌঁছে দেয় এবং সেখানে আমি তাকে তার ভাড়া মিটিয়ে দেব। তখন যদি তারা এই প্রস্তাবে রাজি না হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে জোর ক'রে বাস থেকে নামিয়েও দেয়, তবে শহরে পৌঁছে যাবার পর আমি হেঁটে হেঁটেই চলে যাব। তাই কোন্ সময়ে এবং কোন্ স্থানে পৌঁছে এই কথাটি বলব, তা মনে মনে স্থির ক'রে চুপচাপ বসে রইলাম।

যাত্রী-বিহীন বাসটি ভাঙা স্প্রিং থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সন্তর্পণে কুমিল্লা শহরে প্রবেশ করল। আমারও শহরের উপকণ্ঠে এসে মুখ খুলল। বাসে ছিল ড্রাইভার এবং আরও ত্ব'জন, মনে হয় মালিকপক্ষের একজন, অন্যজন ড্রাইভারের সাহায্যকারী মোটরকর্মী। তারা তিনজনই মুসলমান, আমি যাকে মালিক মনে করেছিলাম, তাকে আধো-আধো কথায় বললাম: কাঁধির পাড়ে কামিনীবাবুর বাড়িতে যেন তারা কেউ আমাকে দয়া করে পৌঁছে দেন, আমি তাঁরই হাতে বাসভাড়া ও আমাকে পৌছে দেবার পারিশ্রমিকও দেব। কামিনীবাবু কুমিল্লার একজন প্রখ্যাত উকিল—সবাই তাকে চেনে এবং আমার কথা শুনে তাদেরও তাকে চিনে নিতে অসুবিধা হল না। আমার এই প্রস্তাবে

মনে হল তারা কেউ অসন্তুষ্ট হলেন না, বরং অচেনা জায়গায় আমাকে এইটুকু সাহায্য করাটা তাদের কর্তব্য বলেই মনে করলেন।

বাস-স্টপ থেকে কামিনীবাবুর বাড়ি খুব নিকটেই। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই তাদের একজন আমাকে সেখানে পৌঁছে দিলেন। কামিনীবাবুর বাড়িতে আমার আশ্রয় পাওয়া ও তাদের অপরিসীম সাহায্যের কথা 'চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে'র দ্বিতীয় খণ্ডে আমি সবিস্তারে লিখেছি। আজকে জেল অফিসে যখন শ্রীমতী ঊষারাণীর সঙ্গে আমার কথোপকথন হচ্ছিল এবং যখন আমার অতীতের বহু স্মৃতি মুহূর্তের মধ্যে মনে এল, ঊষার সেই ছোট একটি প্রশ্ন শুনে—"আপনি শেষ পর্যন্ত কি বিলোনিয়া গিয়েছিলেন ?"—তখন আমার মনে কামিনীবাবুর বাড়ির সব কথাও একসঙ্গে ভিড় ক'রে এসেছে।

এখানে এই ছোট্ট একটি মধুর স্মৃতির বিবরণ দিতে গিয়ে মনে হল অন্তত সুরেনের সঙ্গে আমার নাটকীয় মিলন ও দুঃখজনক বিচ্ছেদের করুণ অথচ বাস্তব ঘটনাও—'আমি সেই মেয়ে' সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে যদি তা লিখি, তবে তা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, অন্তত তাদের কাছে তো নয়ই, যারা আমার দ্বিতীয় খণ্ডটি পড়েন নি। যে ব্যাপক পটভূমিতে, ফেণীর বড়ো একটি বাড়ির "সেই ছোট্ট মেয়েটির" পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বের স্মৃতি যেরূপ অভাবনীয়ভাবে বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে উদ্‌ঘাটিত হয়ে, অতীতকে টেনে বর্তমানের সঙ্গে হাত ধরে দাঁড় করিয়েছে, সেই অতীত কাহিনীর চিত্ররূপকে সামগ্রিকভাবে উপস্থিত করতে গেলে—বিলোনিয়ায় আমার পাওয়া কৃষক-ভাইটির কাহিনীটি তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে ক'রে আমাকে এখানে তা লিখতে হল।

'সেই ছোট্ট মেয়েটি' বাড়ি থেকে আমার চলে যাওয়ার পর বিলোনিয়াতে সুরেনকে আবিষ্কার করার মধ্যে নাটকীয় ঘটনা ও অভিজ্ঞতার বিবরণ এখানে আমি দিয়েছি তা' পড়তে হয়তো অনেক সময় লাগবে, আর অনায়াসেই বুঝে নেওয়া যায় যে, পড়তে যে

সময় লাগবে তার থেকে লিখতে আমার অনেক বেশী সময় লেগেছে, কিন্তু এই ধরনের আরও অনেক কথাই ক্ষণিকের মধ্যে একে একে আমার মনে উদয় হয়েছে। আমি উপস্থিত সকলের সাথে কথা বলছি আর এক একটি ঘটনা আমার মানসপটে ভেসে উঠছিল।

"তুমি বলবে এ যে তত্ত্বকথা, এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব এ সত্য,
তাই এ কাব্য।"

॥ ৫ ॥

বোনটির প্রশ্নের পরে যখন আমি আমার বিলোনিয়া যাওয়া, চাষীভাইটির ঢেঁকিঘর সংলগ্ন ছোট্ট একটি খড়ের ঘরে আমার তিনদিন কাটানো ইত্যাদির ইত্যাদির কথা ভাবছিলাম, তখন আমার লেখা সম্বলিত 'হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডে'র পৃষ্ঠাগুলো বেছে বেছে বিশেষ কয়েকটি পৃষ্ঠা শ্রীমতী ঊষারাণী ও তার ছেলে বিপ্লবকে দেখাচ্ছিলাম। শিল্পীর আঁকা স্টেশনমাস্টারের ঘরের একটি ছবি আছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে টেবিল চেয়ার এদিক ওদিক ছড়ানো আর আহত পুলিশ তিনজন মেঝেতে পড়ে আছে। আর একটি পাতায় দেখালাম কৌপীনধারী পাগলের বেশে আমি চলেছি এবং পেছনে পেছনে বালকের দল আমাকে তাড়া করছে। তারপর দৈনিক কাগজের সেই পাতাটি যেটি বহু পুরাতন স্মৃতি বহন ক'রে আজকের বাস্তব ও জীবন্ত চিত্রের দৃশ্যে উপস্থিত করেছে, আমাকে ও স্নেহের বোন ঊষাকে—সেটিতে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করালাম। চিত্রটিতে রয়েছে "সেই ছোট্ট মেয়েটি"; আর 'সেই পাগলটি'কেও ছবিতে দেখা যাচ্ছে। তাকে দূর থেকে খাবার দিচ্ছে বালিকা ঊষা, আর বালকের দল তার আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে। আজ জেলের কক্ষে এ এক অপূর্ব দৃশ্য!

আমি যখন এই খবরের কাগজের পুরাতন পাতাগুলো দেখিয়ে দেখিয়ে পূর্বস্মৃতির এক একটি ছবি মনের পর্দায় তুলে ধরছিলাম, তখন সেখানে উপস্থিত সকলেই খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিলেন। যদিও মিহির এবং সমীর খবরের কাগজে এইসব লেখা ১৯৫৫ সালেই

পড়েছে, তবুও আমার মনে হল তারাও অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোনিবেশ সহকারে শুনছিল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, শ্রীমান বিপ্লব অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সেইসব পুরনো স্মৃতির খণ্ড খণ্ড ঘটনার বিবরণ শুনছিল। সেখানে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি হল, যেখানে দেখতে পেলাম শ্রীমতী উষারাণীও তার অতীত স্মৃতির আবেশে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে ভাবপ্রবণতা ও আবেগ তাকে অনেকবারই চোখের জল মুছিয়েছে। আর আমার নিজের কথা বলা বাহুল্য যে আমিও নিশ্চয়ই এর মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলাম না। আমার হৃদয়ের আবেগ, প্রাণের স্পন্দন ও গভীর মনের চিন্তারাশি আমাকেও সুমধুর অতীত স্মৃতির স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, এই জেলে আমার সাথে একই মামলায় অভিযুক্ত যে সব তরুণ বন্ধুরা আছে, তারা জানত আমার সঙ্গে আজই শ্রীমতী উষারাণী সাক্ষাৎ করতে আসবে। জেলে সাক্ষাৎ করার সময় বিকেল চারটে থেকে শুরু হয়। আমাদের মধ্যে অনেকেরই আজ তাদের আত্মীয়স্বজনের সাক্ষাৎকার দিন ছিল। তারা সবাই জেলে সমীরকে দেখেছে এবং তারা সবাই জানে যে, সমীর আমার মামলা দেখাশোনা করছে। মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারের মধ্য দিয়ে তারা সকলেই সমীরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। যে ঘরে আমার সাক্ষাৎকার হচ্ছে, ঠিক তার সামনে দিয়ে জেলের অভ্যন্তরে গাড়ি প্রভৃতি প্রবেশ করার জন্য একটি রাস্তা আছে। সেই পথের অপর প্রান্তের একটি ঘরে অনেকেরই একসঙ্গে সাক্ষাৎকার হচ্ছিল। তারা তাদের সাক্ষাৎকারের সময় সমীরকে বলেছে—তারা শ্রীমতী উষারাণীকে দেখতে চায়। সমীর আমাকে জানাল, তাদের মধ্যে অনেকেই খুব ব্যস্ত হয়ে আছে সাক্ষাৎকার শেষে এখানে একটুখানির জন্য আসবে। আমি বললাম—তাতে আর আপত্তি কি থাকতে পারে? আমি যে ঘরে বসেছি সেই ঘরের দেওয়ালে জেলের ভেতরের দিকে মুখ-করা লোহার গরাদ দেওয়া বড়ো জানালা আছে। এই জানালা আবার লোহার

জাল দিয়ে ঘেরা। অনেক সময় এবং বিশেষ নিরাপত্তার জন্য বন্দীরা এইরূপ সুরক্ষিত জানালার অপর প্রান্ত থেকে ভিতরে বসা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে থাকেন। শিক্ষক শ্রীরঞ্জিৎকুমার দে আমার সঙ্গে একই মামলায় অভিযুক্ত হয়ে এই জেলে আছেন। তারও কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ করার দিন ছিল, কিন্তু কোনো কারণে তারা আসতে পারেন নি। তাই তার অসুবিধা হল—সে অফিসঘরে সবার সঙ্গে বসে সাক্ষাৎকারের সুযোগ না পেয়ে খুব অস্থিরভাবে ঘোরাফেরা করছিল। প্রতিদিনের মতো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য যতখানি আগ্রহ ছিল, তার থেকে অনেক বেশী ছিল শ্রীমতী ঊষারাণীকে দেখবার। শেষ পর্যন্ত লোহার জাল আঁটা গরাদের অপর প্রান্ত থেকে সে সমীরকে একটু সরে দাঁড়াতে বলল এবং দূর থেকেই সে ঊষাকে তার নমস্কার জানাল। আমার সঙ্গে অভিযুক্ত সহবন্দীদের মধ্যে আর দু'জন শ্রীমোহনলাল প্রামানিক ও শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য—তারাও আশা ক'রে বসেছিল তাদের 'ইণ্টারভিউ' অন্যান্য সপ্তাহের মতো আজও আসবে। প্রায় পাঁচটা বাজল, তবুও যখন আসছে না, তখন তারা খোঁজ নেবার জন্য জেল অফিসে এল। কিন্তু আসার সময় তারা তাদের ইয়ার্ডে নিজেদের পরিচর্যায় তৈরী ফুলের বাগান থেকে বেছে বেছে শীতকালীন বিভিন্ন বাহারী ফুলের একটি ছোট তোড়া বানিয়ে এনেছিল। মোহনের হাতে সেই ফুলের তোড়াটি ছিল। মোহন ও দেবব্রত একসঙ্গে ঘরে ঢুকল এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে নমস্কার জানিয়ে ঐ ফুলের তোড়াটি ঊষারাণীকে তাদের সবার পক্ষ থেকে উপহার দিল। উপহারটি দেওয়ার সময় মোহন তাকে সসম্মানে অনেক কথাই বলল। সে সব কথা আমার ঠিক মনে নেই। দেবব্রতও কয়েকটি কথা বলেছে, তাও আমি বলতে পারছি না। তবে মনে হল দু'জনেই অভিভূত হয়েছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। শ্রীমতী ঊষা দু'হাত বাড়িয়ে তাদের উপহারটি গ্রহণ করল। বিপ্লব তার মা'র এরূপভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন দেখে বিশেষ আনন্দিত হয়েছে, তা বোঝা গেল। শ্রীমতী

উষার আবেগভরা মনের প্রগাঢ় অভিব্যক্তি, এই মুহূর্তেই সব থেকে বেশী প্রকাশ পায়। শ্রীমতী উষা একেবারে ভাবে বিভোর হয়ে পড়েছে এবং তার আনন্দাশ্রুও গড়িয়ে পড়ল।

এই আনন্দের পালা শেষ হতে না হতেই অন্য ঘরে অনেকেরই 'ইণ্টারভিউ' শেষ হয়েছে। আমাদের একই মামলার সঙ্গী শ্রীগৌরাঙ্গ মজুমদার ও শ্রীগৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী তাদের নমস্কার জানাবার উদ্দেশ্যে এই ঘরে আসবে ঠিক হয়েছে। গৌরীশঙ্কর জেলে আসার আগে একটি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। আর গৌরাঙ্গ জেল থেকেই B, A. পরীক্ষা দিয়েছে এবং পাসও করেছে। তারা দু'জনেই তাদের 'ইণ্টারভিউ' শেষ হওয়ামাত্রই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল ঘরের মধ্যে। তারাও ভাবপ্রবণ বিজড়িত কণ্ঠে অনেক কিছুই বলল এবং শ্রীমতী উষাকে জানাল তাদের আন্তরিক অভিনন্দন। শ্রীমতী উষারাণী এইরূপভাবে একের পর এক আমার সহবন্দীদের কাছ থেকেও অপ্রত্যাশিতভাবে অভিনন্দিত হবে তার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। আর মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ এতজন রাজনৈতিক বন্দীর আন্তরিক শ্রদ্ধা যে তার মায়ের জন্য সঞ্চিত ছিল—এ কথা বিপ্লবও ভাবতে পারে নি। শ্রীমতী উষারাণী বা বিপ্লব এরূপ কথা আগে ভাববেই বা কি করে? সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা—আমিও কি জানতাম উষারাণীর প্রতি আমার তরুণ বন্দীভাইদের এতখানি শ্রদ্ধা সঞ্চিত আছে, আর তার প্রকাশ ঘটবে এমনিভাবে?

একটি কথা এখনও বলা হয় নি। শনিবার দিন বিকেলে জেলের সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট সচরাচর অফিসে আসেন না। কিন্তু আজ বিকেলে তিনি হঠাৎ জেল-অফিসে এলেন এবং সোজা আমি যেখানে 'ইণ্টারভিউ' করছি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমি তার এই-রূপ আকস্মিক উপস্থিতি দেখে বুঝলাম তিনিও ইচ্ছুক ছিলেন শ্রীমতী উষারাণীকে দেখবার জন্য। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তিনি বহু পূর্বে আমার লেখা বইয়ের সব ক'টি খণ্ড পড়েছিলেন এবং তাঁর খুবই

কৌতূহল ছিল, পঁয়তাল্লিশ বছর পরে শ্রীমতী ঊষারাণীকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে, তিনিও তাকে একবার দেখবেন। আমার অনুমান মিথ্যে নয়। তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি শ্রীমতী ঊষাকে তাঁর পরিচয় দিলাম। ঊষা তাঁকে বসার জন্য অনুরোধ জানাল। জেল সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট, শ্রীরণেন্দ্রনাথ মুখার্জী একটু হেসে বললেন—"আপনারা কথা বলুন, আমি আসি।" তিনি বিদায় নিলেন।

আমার একটি কাজ তখনও বাকি আছে। আমি আমার বইটি—'চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহে'র প্রথম খণ্ড, যেটি উপস্থিত আমার কাছে ছিল, সেটি শ্রীমতী ঊষাকে দেব বলে স্থির করেছিলাম। আমি বইটিতে লিখলাম—"স্নেহের বোন ঊষারাণীকে—দাদা।" এইটুকু লিখে "দাদা'র নিচে অনন্ত সিংহ নামটি সই করলাম এবং তারিখ দিলাম ২২-২-৭৫। তারপর শ্রীমান বিপ্লবকে আমার লেখাটা দেখালাম। ঊষারাণীকেও দেখাবার পর বইটি বিপ্লবের হাতেই দিলাম।

সচরাচর যেটুকুও সময় সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ধারিত করা থাকে, আজকে এই বিশেষ সাক্ষাৎকারের জন্য সেই নির্ধারিত সময় অতিক্রম ক'রে ফেলেছিলাম সমীর দু'একবার আমার মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে বলল—সময় হয়েছে। এই কথা শুনে শ্রীমতী ঊষারাণীর বলল—"তবে তো এখন যেতেই হবে।" আমি বললাম, এই বিশেষ সাক্ষাৎকারটি এবং তুমি যে বহু বছর পর বহু দূর থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ—এইটুকু বিবেচনা জেল কর্তৃপক্ষ করবেন এবং কিছু সময় যদি আমরা বেশী নিই তবে তাঁরা আপত্তি হয়ত করবেন না। আমাদের কথা তখনও চলছে। ঊষার কাছে আমার একটি কথা জানার বিশেষ ইচ্ছে হল, তাই জিজ্ঞেস করলাম—তার বাবা কি করতেন, তিনি কি জমিদার ছিলেন? ঊষা আমাকে বলল, তার বাবা কোনো এক বড়ো এস্টেটের নায়েব ছিলেন এবং তাঁর নিজেরও প্রচুর জায়গা জমি ছিল। আরও প্রশ্ন ক'রে জানলাম, তার বাবা সর্বদা মোটা খদ্দর পরতেন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের

আন্দোলনের প্রতি তাঁর ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। তাদের ফেণীর সেই বাড়িতে তদানীন্তন বাংলার অনেক কংগ্রেস নেতাই গিয়েছেন। এরপর উষা আমাকে খুব গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে জানাল যে, আমার সেই পাগল বেশে উপস্থিতির দু'তিন দিন পর বা কিছু দিনের মধ্যেই পুলিশ দাদাকে গ্রেপ্তার করেছিল। তবে মনে হল বোধ হয় কোনো সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য তার দাদা গ্রেপ্তার হন নি।

সমীর আবার আমার মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে বলল, উষাদিকে যদি আজকে আমরা ছেড়ে দিই, তবে খুব ভালো হয়, কেননা তাঁকে অনেক দূরে যেতে হবে। তাছাড়া তিনি বালিগঞ্জে তাঁর বোনের বাড়ি হয়ে যাবেন ব'লে তাঁর বাড়ি পৌছতে আরও অনেক দেরি হয়ে যাবে। উষা সমীরকে তক্ষুনি বাধা দিয়ে ব'লে উঠল—"না-না, 'ইন্টারভিউ' আগে শেষ করার দরকার নেই, যতক্ষণ বসা যায় বসি না কেন! আমি আজ আর বোনের বাড়ি নাইবা গেলাম। না হয় অন্য একদিন সেখানে যাব। আজকে এখানে যতক্ষণ বসা যায় ততক্ষণ বসি।" তার এইরূপ আগ্রহ দেখে আমার খুব ভালো লাগল। আমারও ইচ্ছা ছিল এই সাক্ষাৎকারটি যেন এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে না যায়। কথা বলার বিশেষ কিছুই ছিল না। প্রাথমিক কথা মোটামুটি সবই বলা হয়েছে আর বাকি সব কথা তো একদিনে শেষ করা যাবে না। উষা তার পোস্টকার্ডটিতে লিখেছিল—"আমার অনেক বলতে ও আপনার কাছ থেকে অনেক জানতে ইচ্ছে করে।" সত্যি এইরূপ ইচ্ছা আমিও পোষণ করি। তবে অনেক সময় হয়েছে, আর দেরি করা হয়ত জেলের বিধি অনুযায়ী অনুচিত হবে ভেবে আমি অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বললাম: "উষা, আজ এখানেই থাক। তোমাদের অনেক দূর যেতে হবে। বিপ্লবের হয়ত ক্ষিদে পেয়েছে। তোমরা বেলা একটার সময় বেরিয়েছ, খুব ক্লান্ত হয়েছ, তোমরা বরং এখন এস। তোমরা কতদূর যাবে। আমি তো এই আমার বাড়িতে, অর্থাৎ আমার সেলে গিয়ে বিশ্রাম নেব। না-না, আর দেরি নয়।"

যেতেই হবে। জেলের দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত নয়। আমাকে তো থাকতেই হবে। বন্দীদের সাক্ষাৎ শেষে যখন আসে বিদায় মুহূর্ত, সে সময় বন্দীদের আত্মীয়বন্ধুদের যে মানসিক অবস্থা হয়, তা কেবল বন্দী ও সাক্ষাৎকারীদের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব। আমি আমার কল্পনাপ্রবণ মন দিয়ে অনুভব করছিলাম, ঊষার মনে এই বিদায় পালা কি ভাবের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ঊষা উঠল, আমিও উঠলাম। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। ঊষা ও বিপ্লব দু'জনেই আবার আমাকে প্রণাম করল। আমি আগের মতোই বিব্রত বোধ করেছি। আমার আশীর্বাদ তাদের জানিয়েছি। এখন এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ হল। তারা ঘর থেকে বেরল আর সমীর তাদের এগিয়ে দিতে জেলের বাইরে গেল। আমি তখন মিহিরকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার বইতে যা পড়েছ, সেই বিবরণ কি মিলেছে ? মিহির উত্তর দিল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, সব মিলেছে। অবিকল সব ঠিক আছে।" তারপর আমি একটু যোগ ক'রে বললাম, "আমি বইতে লিখেছিলাম, বাড়ির বিশেষ দ্রষ্টব্য মন্দির প্রভৃতি দেখে আমার ঐ বাড়ির লোকজন-দের সম্বন্ধে, বিশেষ ক'রে বাড়ির কর্তা সম্বন্ধে অনুমান হয়েছিল যে, তিনি কোনো এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হবেন। সেই দেখে আমার আন্দাজ করতে হয়েছিল ঐ পরিবেশে এই বাড়ির অন্যান্যরাও কিরূপ চরিত্রের হতে পারেন। বাড়ির কর্তা যদি উপযুক্ত হন, তবে তার প্রভাব বাড়িতে অন্য সবার মধ্যে কিছু প্রতিফলিত হয়। আজকে আমার যে কি ভালো লাগছে, মিহির তোমায় কিভাবে বোঝাব। নিরীক্ষণ ক'রে দেখার জন্য আমি কতটুকুই বা সময় পেয়েছিলাম ! দশ-পনের অথবা খুব বেশী হলে মিনিট কুড়ির বেশী সময় আমি পাই নি। সেইটুকু সময়ের মধ্যে সেই বালিকাটিকে ক'মিনিটই বা দেখতে পেয়েছি। এই-টুকু সামান্য সময়ের মধ্যেই তার চালচলন, কথাবার্তা, দরদ বালকদের ওপর তার প্রভাব, দীনদরিদ্রের প্রতি তার করুণা প্রভৃতি সূক্ষ্ম নিদর্শন-গুলোর বৈশিষ্ট্য অনুধাবন ক'রে যে সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছিলাম

এবং সেই লক্ষ্মীপ্রতিমাকে আমি যে ভাবে বর্ণনা করেছিলাম, তা পঁয়তাল্লিশ বছর পরে এভাবে মিলে যাবে সে কি আমি তখন ভাবতে পেরেছিলাম। আমি ঊষারাণীর পোস্টকার্ডটি বার দশেক পড়েছি এবং বিশেষজ্ঞদের মতো অনুধাবন করেছি। দেখ, সে শুরুতেই লিখেছে—"ওঁ রামঃ," আরও লক্ষ্য করলে দেখতে "ঈশ্বরের উদ্দেশে," "৺ভগবানের ইচ্ছা," "৺ঠাকুরই জানেন" প্রভৃতি তার চিঠিতে লেখা আছে। এই সব লেখা থেকে তার মানসিক গঠন সম্বন্ধে একটি ধারণা করতে আমার সাহায্য হয়েছে। সেই ধারণা তাকে দেখে মিলে গেল। তার বেশভূষা, শাঁখা-সিঁদুর প্রভৃতি তাকে বাংলাদেশের "আদর্শ মা" বলেই পরিচয় দিচ্ছিল। তারপর তুমিও হয়ত নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রে থাকবে সে তার ছেলেদেরও নাম রেখেছে—বিক্রম, বিপ্লব ও বিধান। নামগুলো শুনেই আমি কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, এইরূপ নামকরণ কে করেছে। তুমিও শুনে থাকবে ঊষা সলজ্জ-ভাবে আমাকে জানিয়েছিল সে নিজেই এই নামগুলো রেখেছে। এই নাম নির্বাচনের মাধ্যমেও কিন্তু ঊষার চারিত্রিক গঠন, মনের প্রবণতা ও তার প্রকৃতি প্রভৃতি একটি বিশেষ ধারার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে—তাই নয় কি ? তারপর তুমি বিপ্লবের মানসিক গঠনের দিকটাও ভেবে দেখ। এই তো তার বয়স। আজকালকার আবহাওয়ার মধ্যেই সে স্কুল কলেজে পড়েছে, অনার্স নিয়ে B.Sc. পাস করেছে, Law ও welfare Training একসঙ্গেই পড়ছে, তবু দেখ তার মতো একজন তরুণ চা খায় না—চায়ে তার বিতৃষ্ণা। এসব থেকে এবং এত সময় তাকে মায়ের পাশে বসে থাকতে দেখে এমনি মনে হয়েছিল যে, তার বোধ হয় সিগারেট প্রভৃতির ওপর কোনোরূপ আসক্তি নেই। বিপ্লবের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতার মধ্যে তার মায়ের ও তার বাড়ির প্রভাব পুরোপুরি আছে বলেই আমার মনে হয়।" মিহির তক্ষুনি বলে উঠল—"নিশ্চয়ই মা-বাবার প্রভাব ছেলেমেয়েদের ওপর থাকবেই। সত্যই ঊষাদি ও তার ছেলেটির শান্ত স্বভাব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।"

আমাকে সে আরও বলতে লাগল—"দাদা, আপনাকে কিন্তু এই সমস্ত ঘটনা লিখতে হবে। এই সব বাস্তব ঐতিহাসিক জীবন বৃত্তান্ত যে-কোনো উপন্যাসের ঘটনা ও কাল্পনিক কাহিনীকে ম্লান ক'রে দেয়। আপনি এই বিষয়টি নিয়ে যতশীঘ্র পারেন লিখে রাখবেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি যদি আপনার জীবিত অবস্থায় ছাপা না হয়, তবু যেন আপনার অবর্তমানেও কোনোদিন আমরা ছাপিয়ে প্রকাশ করতে পারি।" আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম—তা হবে এখন লেখা যাবে।

সমীর এতক্ষণ তাদের বাসে তুলে দিয়ে আবার ফিরে এসেছে। সে বলল, দিদিকে দেখলাম যাবার সময় গভীর বেদনা নিয়ে চলে যাচ্ছেন। আর মুখেও ঊষা সমীরকে ব'লে ফেলল : "দাদাকে জেলে রেখে আমরা এখন সবাই নিজের নিজের বাড়ি যাচ্ছি। মনে খুবই কষ্ট হচ্ছে। কিছু করার উপায় নেই—সবই নীরবে সহ্য করতে হবে, সবই ভগবানের ইচ্ছা।

সমীরের কথাগুলো আমরা দু'জনেই শুনলাম। আমি আমার আগের কথার জের টেনে ঊষার হৃদয়ের কোমলতা সম্বন্ধে বলতে লাগলাম—"Morning shows the day ? প্রভাতেই দিনের বার্তা সূচিত হয়, এ কথাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনস্বীকার্য। 'সেই ছোট্ট মেয়েটির' হৃদয়কুসুমে সেই দিন মানুষের জন্য যে মায়া-মমতা ও দরদ ছিল, আজ পঞ্চান্ন বছর বয়সেও তার অন্তরে সেইসব মনোহর কমনীয় গুণাবলী একটুও ম্লান হয় নি—এ যেন চিরভাস্বর ও চির উদ্ভাসিত হয়ে আছে। তার পোস্টকার্ডটিতে আরও লক্ষ্য করেছিলাম ভাবাবেগ রুদ্ধ করতে না পেরে সে লিখেছে—"সবই ৺ভগবানের ইচ্ছা, নতুবা যে দেশের স্বাধীনতার জন্য এত কষ্ট করলেন সেই দেশেও আবার কারাগারে বন্ধ হয়ে আছেন।" তারপরের লাইনটি লিখতে গিয়ে একেবারে মনের দুঃখ, কষ্ট, রাগ ও অভিমানে সে যেন ভেঙে পড়েছে—অতি ক্ষোভে সে যেন একেবারে ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। তাই

লিখল—"এ সব কথা ভাবতেও পারি না। লিখবার মতো বা বলবার মতো ভাষাও আমার নেই। তবুও আপনার সব জানতে, আমার সব বলতে ইচ্ছে করে।"

সমীর ও মিহির দু'জনকেই বললাম—এক এক সময়ে মনে হয় এ যেন আমার অত্যধিক বাড়াবাড়ি। তোমরা কি মনে কর জানি না, তবে যাদের জীবন-ইতিহাসের পাতায় এরূপ একটিও রঙিন ছবির খোঁজ পাওয়া যায় না, আর যাদের স্বাভাবিক শিল্পী মনের কল্পনার সঙ্গে কোনো পরিচয়ই ঘটে নি—তাদের কাছে এসব বাড়াবাড়িই মনে হবে—তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? আমার এই অবিস্মরণীয় জীবননাট্যের মধুর সংগীতের মূর্ছনা কি তাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব—যাদের অনুভূতি ধুধু সাহারার কাঠিন্যে ও উত্তপ্ত বিস্তীর্ণ বালুকারাশির মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে ঝল্‌সে গেছে? হয়ত এ আমার খুবই বাড়াবাড়ি। ঊষা এমন আর কি—স্বাধীনতা যুদ্ধে কিইবা তার অবদান? নাবালিকা ঊষা সেদিন কিছু না জেনেশুনেই একজন ক্ষুধার্ত পাগলকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু আহার্য দিয়েছিল—এর বেশী তো আর কিছুই না। হ্যাঁ সত্যই, মাত্র ঐটুকুই—তার বেশী কিছু নয় বটে!

কিন্তু 'কিছুই নয়' ঘটনাটির সমাধি কেন সেই দিনই হয়ে যায় নি? ত্রিশ-একত্রিশ বছর পরে কেন আমি সেই নগণ্য ঘটনাটি এবং সেই সামান্য বালিকাটির কথা ১৯৫৫ সালে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে' লিখতে গেলাম? আর কেনইবা এর পরেও 'সাপ্তাহিক বসুমতি'র পাতায় এই ঘটনাটি পরিবেশন করতে ইচ্ছে হল? কিসের তাগিদে বা কার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১লা জুলাই, ১৯৫৫ সালে বইতে ছাপলাম—"ভারতের স্নেহময়ী নারীর প্রতিমূর্তি সেই শ্রদ্ধেয় বালিকাটির প্রতি আজ আমার আবেদন, যদি কোনোদিন আমার এই লেখাটি পড়ে সামান্য ঘটনার স্মৃতি তাঁর মনে জাগে, তবে কোনো আপত্তি না থাকলে একটি চিঠি লিখলে খুশী হব—"?

এটা কি একেবারে স্বপ্ন বলে মনে হয় না যে, তার বোনের ছেলে কোনো একদিন আমার বইটি পড়ে বুঝবে তার মাসীমাই হলেন সেই "সেই মেয়ে" এবং সে গিয়ে তার মাসীমা, অর্থাৎ শ্রীমতী ঊষারাণীকে সেই কথা জানাবে? সব থেকে আশ্চর্যের কথা, ঐ একটুখানি বালিকার পক্ষে ঐদিনের কয়েক মুহূর্তের ঘটনাকে কিরূপে স্মরণ রাখা সম্ভব হল? আবার ১৪-২-৫৫ তারিখে ঊষার চিঠি, ১৮ই ফেব্রুয়ারীতে সেই চিঠির আমার দেওয়া উত্তর এবং ২২শে ফেব্রুয়ারীই আমার সঙ্গে তার দেখা করতে আসার বাস্তব ঘটনাবলীই কি সেই বিগত কয়েক দশকের তুচ্ছ বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা যায়? সেই দিনের বালিকা ঊষা, স্বাধীনতাযুদ্ধের একজন সৈনিককে না জেনে না চিনে সাহায্য করেছিল বলেই কি তার সাহায্য আমরা ভুলে যাব? আমি বইতে লিখেছি: "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই অনামী অখ্যাত সামান্য ছোট্ট মেয়েটির কি স্থান থাকবে না?"

ঊষার বাড়ির ঐতিহ্য, তদানীন্তন সমাজে তাদের সমাদর ও প্রতিষ্ঠা এবং তার বাবার স্বাদেশিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—এ সব কি বালিকা ঊষাকে প্রভাবান্বিত করে নি? বাড়ির প্রভাব কি তার সেই অজানা অচেনা এক দুঃস্থ ও দুর্দশাগ্রস্ত পাগলকে আহার্যদানের মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে নি? তাদের ফেণীর সেই বাড়ির সুন্দর পরিবেশ ও অতগুলো সাজানো মন্দিরের একসঙ্গে অবস্থিতি বাড়িটিকে অপরূপ গাম্ভীর্যে ও অপরিসীম স্নিগ্ধতায় ভরে রেখেছিল, সেইদিন আমি তাই দেখে ঐ বাড়ির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম এই ভেবেই যে, হয়ত বা এই বাড়িতে কোনো দরদী মানুষের সন্ধান পাব। বাড়িটির সহজ ও স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ও স্নিগ্ধতা আমাকে প্রাথমিক গবেষণা করতে সাহায্য করেছিল। এই বাড়ির মুখ্য অভিভাবক-অভিভাবিকা সাধারণত কিরূপ চরিত্রসম্পন্ন হবেন এবং তাঁদের নৈতিক প্রভাবও যে বাড়ির ছেলেমেয়ে ও অন্যান্য সকলের ওপর প্রতিফলিত হবে, সেটি আমি অনুমান ক'রে নিয়েই বাড়িটিতে প্রবেশ করেছিলাম।

সেইদিন সেই বাড়ির ছোট মেয়েটিকে দেখে মনে হয়েছিল সে সাধারণের চাইতে স্বতন্ত্র। আর তার কয়েকটি সুলক্ষণ দেখে আমার বিশ্বাস হয়েছিল, তার মা বাবা আদর্শ অভিভাবক। আজ উষার মুখে শুনলাম তার বাবা সব সময়ই খদ্দরের জামাকাপড় পরতেন ও তাদের বাড়িতে বাংলাদেশের তদানীন্তন কংগ্রেসী নেতাদেরও যাতায়াত ছিল। কাজেই ধরে নিতে পারি তার বাবার সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আন্দোলন ও সংগ্রামে সমর্থন ছিল। তা ছাড়া আমি তাদের বাড়ি যাবার দিন কয়েক পরেই ব্রিটিশ শাসক-দের হাতে তার দাদা বন্দী হয়েছিলেন। এই সব কিছুর সমষ্টিগত প্রভাব উষাকে যে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল, সে কথা ভাবা কি আমাদের পক্ষে অবান্তর হবে?

উষার স্বদেশপ্রেমের নিদর্শন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার ওপর নির্ভর করে না। তাকে বুঝতে হলে তার বাবার স্বদেশপ্রেম, তাঁর সব সময় খদ্দর পরার দৃষ্টান্ত মনে রাখতে হবে। এই সামান্য দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ ক'রেই এক জনের স্বদেশপ্রেমের গভীরতা বোঝা যায়। আমি আগে যে প্রখ্যাত উকিল ও কংগ্রেস নেতা ৺কামিনীবাবুর কথা উল্লেখ ক'রে গেছি, তিনি কংগ্রেস আন্দোলনের শুরু থেকেই খদ্দর পরতে আরম্ভ করেছিলেন এবং তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি খদ্দরের ব্যবহার বজায় রেখে গেছেন। আমার দিদি ৺ইন্দুমতি সিংহ চট্টগ্রামের গণতন্ত্রী বাহিনীর সদস্যা ছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে মাস্টারদার নেতৃত্বে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেদিন বাংলার মেয়ে শান্তি ও সুনীতির পিস্তলের গুলিতে কুমিল্লার জেলাশাসক মিঃ স্টিভেন্সকে প্রাণ দিতে হল, ঠিক সেই দিনই আমার দিদি ও কামিনীবাবু ব্রিটিশ কারাগারে বন্দী হলেন।

এই ঘটনায় আমার দিদির কি কোনো অপরাধ থাকতে পারে? পুলিশ তাদের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনায় দিদিকে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়াতে চাইল। দিদির অপরাধ, আগের দিন বিকেল চারটায়

চট্টগ্রাম জেলে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সেইদিন রাত্রের ট্রেনে কুমিল্লা রওনা হন। সকালে তিনি কুমিল্লায় ৺কামিনীবাবুর বাড়িতে গেলেন। পুলিশের হাতে এই তথ্যই একটি অব্যর্থ প্রমাণ তো বটেই এবং তারা তাদের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনায় সেই হত্যা-কাণ্ডের সঙ্গে দিদির সংযোগ আবিষ্কার করল। ব্রিটিশ পুলিশের পক্ষে দিদিকে দোষী সাব্যস্ত করতে তার বেশী প্রমাণের কি অপেক্ষা রাখে? কামিনীবাবুর বাড়ির সঙ্গে আমাদের বহু বছরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, আর দিদি আমার সঙ্গে দেখা করার পর তাঁদের বাড়িতেই উঠেছেন, অতএব পুলিশের চোখে কামিনীবাবুও দোষী ব'লে পরিগণিত হলেন। দিদির সঙ্গে কামিনীবাবুও কুমিল্লা জেলে আবদ্ধ হলেন।

আমার দিদি ৺ইন্দুমতী সিংহ বিপ্লবী সংগঠনের সদস্যা ছিলেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবকে তিনি তাঁর জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও সব সময় খদ্দর পরিধান করা শ্রেয় মনে ক'রে নিয়ে ছিলেন। প্রসঙ্গত আরও বলি, মহানায়ক সূর্যসেন—মাস্টারদাও সব সময় খদ্দরের জামাকাপড় পরতেন। কংগ্রেসের তথাকথিত নেতা সাজার জন্য তিনি এই খদ্দর ব্যবহার করতেন না। তাঁর এই খদ্দর পরিধানের মধ্যে কোনোরূপ ফাঁকি-ঝুঁকি ছিল না। তিনি অন্তর দিয়েই বিশ্বাস করতেন, স্বদেশী শিল্পের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। জাতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রসারতা চাই—এটাই ছিল তার মনস্কামনা। খাদি প্রতিষ্ঠানের গ্রামোদ্যোগ সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা সব সময়েই অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি নিজেই যে শুধু খদ্দর পরতেন, তা নয়, তিনি আমাদের ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের প্রায়ই বলতেন, আমরা সবাই খদ্দর পরতে যেন কখনও কুণ্ঠাবোধ না করি। বিদেশী কাপড়ের পরিবর্তে খদ্দর ব্যবহারের প্রচার করতে তিনি কখনও শিথিলতা দেখান নি। আমার এতসব বলার উদ্দেশ্য হল এই যে, মানুষের বেশভূষার মধ্য দিয়ে তার মানসিকতার একটা দিক সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। যেমন নাকি বিশেষ ধরনের প্যান্ট-শার্ট, বুশকোট বা বিশেষ ধরনের ধুতি চাদর ও এই

সবের বিশেষভাবে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে বিশেষ মনোবৃত্তি প্রকাশ পায়, ঠিক তেমনি তৎকালের খদ্দরের জামাকাপড় পরিধানের মধ্যেও চারিত্রিক গঠন ও মনের অনুরূপ প্রবণতার পরিচয় পেতে সাহায্য করত। তেমনি আবার আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসের মধ্যে "সময়ানুবর্তিতা" থাকা না থাকার জন্য যে তারতম্যের সৃষ্টি হয়, তা থেকে বোঝা যায় ব্যক্তি বিশেষের নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও মনের দৃঢ়তার পরিধি। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যা দেখেছি, তা থেকে আমি খুব জোরের সঙ্গেই বলতে পারি—যে ব্যক্তি সময় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, অর্থাৎ সে যেমন নিজের কাজে সময়জ্ঞানহীন, তেমনি অপরের সময়ের মূল্যও সে বোঝে না এবং যে ব্যক্তি নিজে বিশৃঙ্খলতার মধ্যে থাকাটা অভ্যাসে পরিণত করেছে, সে ব্যক্তি কখনও কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে নির্ভরশীল ব'লে পরিচিতি লাভ করতে পারে না। এইরূপ ছোট ছোট জিনিস, যেমন নাকি—তৎকালে খদ্দর পরা, সময়ের গুরুত্ব বোঝা, প্রখর সময়জ্ঞান এবং বাল্য বয়সেই দরিদ্রসেবার স্পৃহা ইত্যাদির মধ্যে জীবন, চরিত্র বোঝার বহু উপাদানই থাকে। এসব বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কারণ চরিত্রের এই সমস্ত দিক বাদ দিয়ে মানুষের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

শ্রীমতী ঊষারাণীকে বুঝতে গেলে তার সমস্তটা নিয়েই বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে এবং ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে তারও একটি অবদান আছে, তা আমরা কোনো মতেই অস্বীকার করতে পারি না। ভারতের বিরাট স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এইরূপ অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবদান স্বদেশপ্রেমের নীরব সাক্ষ্য বহন করছে। এইরূপ ছোট ছোট বারিবিন্দু একত্রিত হয়েই ভারতে স্বাধীনতা যুদ্ধ জয়ের প্রাক্কালে মহাসাগরে পরিণত হয়েছে, যার উত্তাল তরঙ্গ ব্রিটিশ শাসনের বুনিয়াদকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সার্বিক বিচার বিশ্লেষণ ক'রে সেই নাবালিকা ঊষারাণী আজ যখন ইতিহাসের সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের ঘনঘোর কুজ্ঝটিকার অবসান ক'রে স্বীয় পরিচয় নিয়ে

আবার ইতিহাসের পাতায় উপস্থিত হয়েছে, তখন দেশবাসী তাকে নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাবে।

শ্রীমতী ঊষার বাড়ির স্বদেশপ্রেমের ঐতিহ্য ; তার বাবার কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ; তার দাদার ইংরেজের কারাবরণ—এসব তো আর মিথ্যে নয়। এ ছাড়া বর্তমানে আমাকে ঊষার লেখা চিঠিটি একটু মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে তার অন্তরে স্বদেশপ্রেম চির জাগ্রত। আর আমার মতো একজন বন্দীকে শ্রদ্ধা জানানো ও স্নেহাস্পদ ছোট বোনের দাবী নিয়ে আমাকে দাদার আসনে বসানোর মধ্যে দিয়েও তার স্বদেশপ্রেমের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যে, এইটিই ঊষার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, যার উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়েছিল যখন সে ছিল নেহাতই একটি বালিকা। তবুও কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, সবই তো ঠিক ছিল—কিন্তু ঊষারাণী তার উজ্জ্বল ঐতিহ্য ও অবদানকে একজন—"দুশ্চরিত্র সমাজ-বিরোধী ডাকাত," অনন্ত সিংহের প্রতি, ভক্তিশ্রদ্ধা জানিয়ে নিজের অতীত ঐতিহ্যকে ম্লান করল কেন ? তাদের সেইরূপ মনোভাবের প্রত্যুত্তরে এ কথাই বলব যে, 'অনন্ত সিংহ সত্যই কি'—তার উত্তর আগামী দিনের ইতিহাসই দেবে। এ কথা ভুললে চলবে না যে, সেই সর্বোচ্চ আদালত—জনগণের আদালতের রায়কেই চূড়ান্ত ব'লে গণ্য করতে হবে।

ঊষা যদি পুলিশ বা বিপক্ষ দলের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে, অনন্ত সিংহের প্রতি তার শ্রদ্ধা ভক্তি জানায়, তবে কি তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়, এবং সেই অজুহাতে তার অতীত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টাকে কি আমরা প্রশংসা করতে পারি ? আর যদি ধরেই নেওয়া হয়, অনন্ত সিংহ বর্তমান অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে দোষী বা নির্দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, তবুও সেইরূপ সমাজব্যবস্থায় প্রভাবান্বিত সিদ্ধান্তের ওপর যদি কারো আস্থা না থাকে, তবে কি তা অপরাধের ? সবল মনে ঊষা যদি বর্তমান সমাজ-

ব্যবস্থা ও তারই প্রভাবে পরিচালিত বিচারের প্রতি আস্থা রাখতে না পারে, তবে তা কি উষারাণীর অপরাধ, না কি সেইরূপ সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন ? এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সঙ্কীর্ণ দলগত উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের ঊর্ধ্বে থেকেই বিচার করতে হবে উষারাণীর অতীত ঐতিহ্য ও স্বদেশপ্রেমকে।

মিহির, সমীর ও আমার মধ্যে এইধরনের একটু আলোচনা হল। আমি আমার অভিমত তাদের কাছে এইভাবেই ব্যক্ত করেছি।

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।"

॥ ৬ ॥

ছ'টা বাজল। এখন জেলখানার 'লক-আপে'র সময়, তাই তাদের কাছে বিদায় নিয়ে আমি আমার সেলে ফিরে এলাম। উষার চিঠি পাওয়া, তাকে আমার উত্তর দেওয়া, সেই সঙ্গে জেলে দেখা করতে আসার পদ্ধতি জানিয়ে সমীরের তাকে চিঠি লেখা এবং পত্রপাঠমাত্র তার ছেলেকে সমীরের কাছে পাঠিয়ে তার পরদিনই সোজা জেলে আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ করতে আসা—এ সবই এতক্ষণে শেষ হল। উষার চিঠি পাওয়া অবধি আমি অধীর উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম। আজকে এই দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটার পর সেলে ফিরে এসে পরম প্রশান্তি অনুভব করছিলাম। একটি মধুর স্বপ্নের আবেশ আমার এখনও কাটে নি। উষার কাছে তার ছেলেমেয়েদের সংবাদ ও বিবরণ জানার পর খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের কথা আমার মনে উঠতে লাগল। আমি মনে মনে ভাবছিলাম যত শীঘ্র পারি তার ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে আরও বিস্তারিতভাবে জানব এবং তার স্বামীর সম্বন্ধেও জানব। ইচ্ছে হচ্ছিল উষাকে নিয়ে কিছু একটা লিখি আর সেইজন্য এইসব তথ্য আমার প্রয়োজন। কখন কিভাবে সেইসব সংবাদ তার কাছ থেকে পাব সে কথাই ভাবছিলাম—কাউকে পাঠাব? চিঠি লিখব কি? নাকি তাকেই আসতে বলব?······

উষাকে আমি 'চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ'র প্রথম খণ্ডটি উপহার দিয়েছি

আর বিপ্লব ও উষা দু'জনকেই বলেছিলাম ইতিমধ্যে 'দ্বিতীয় খণ্ড' ও 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' বই দু'টি সংগ্রহ ক'রে রাখব—আবার যখন দেখা হবে, তখন তাদের আমি সে দু'টি বই দেব। সেদিন আমি তাদের বই দু'টি এসে নিয়ে যেতে বলি নি এবং তাদের জিজ্ঞাসাও করি নি কবে আবার তারা আসবে? এ আমার মনের সঙ্কোচ, পাছে আমার মনের অভিপ্রায় জেনে বাধ্য হয়েই অতদূর থেকে খুব শীঘ্রই তাদের আবার আসতে হয়। আমি ভাবছিলাম সময়মতো চিঠি লিখব এবং চিঠিতে যদি আর কিছু পরিচিতি জেনে নেওয়া সম্ভব হয়, তবে তাই করব।

এখন সেলে একা একা বসে আমার মনে অনেক কথাই উঠছে। উষাকে আমি আমার অন্তরের সমস্ত শুভ কামনা দিয়েই আশীর্বাদ করেছি, যাতে আরও সুখের, আরও মহিমান্বিত হয়ে ওঠে তার জীবন। উষা এখন তিনটি কন্যা ও তিনটি পুত্রের আদর্শ জননী। সে আদর্শ স্বামী পেয়েছে। তার সুখের সংসার। তার ছেলেরা শিক্ষা লাভ করেছে এবং আজ তারা উন্নতির সোপানে। বড়ো ছেলেটি এখন আছে লণ্ডনে উচ্চশিক্ষার জন্য। মেয়েদের বিয়ে হয়েছে। কেবল একটি মেয়ের বিয়ে এখনও বাকী। আশা করা যায় এ মেয়েটিরও অতি শীঘ্রই শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হবে। উষার যে ছেলেটি সঙ্গে এসেছিল, দেখলাম মায়ের প্রতি সে খুবই অনুগত এবং তাকে দেখে মনে হয় আর দু'টি ছেলেও এমন আদর্শ মা-বাবার অনুগত না হয়েই পারে না। কেইবা আমাকে তোয়াক্কা করে, কেন আমার আশীর্বাদের আশায় তারা বসে থাকবে? তবু উপযাচক হয়েই আপন মনে তাদের সকলের কল্যাণ কামনা ও আন্তরিক আশীর্বাদ জানিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করছিলাম।

প্রতিদিনের মতো আজও খাওয়াদাওয়ার পর রাত এগারোটা পর্যন্ত একটু লেখাপড়া ক'রে আশ্রয় নিলাম বিছানায়।

জানিনা কেন আজ এত ক্লান্ত লাগছে। আজকের এই আনন্দের দিনে কেন এত ক্লান্তি! কিসের জন্য এই অবসন্নতা! ঠিক ব'লে

বোঝানো যাবে না, তবু মনে হয় একটা মানসিক অশান্তি আমাকে খুবই বিচলিত করছিল। সেটি হচ্ছে, মামলার বৈধতার প্রশ্নে এবং সরকার পক্ষের অনেক আইনভঙ্গের নজির উল্লেখ ক'রে হাইকোর্টে মোশান (অর্থাৎ সরকারী পক্ষের অনুপস্থিতিতে দরখাস্ত) করেছি। মাননীয় বিচারপতিদ্বয় আমার দরখাস্তের আইনগত গুরুত্ব বিবেচনা ক'রে সরকারী পক্ষকে পনেরো দিনের মধ্যে অনন্ত সিংহের বিরুদ্ধে মামলা কেন বাতিল হবে না, তার কারণ দর্শাবার জন্য আদেশ দিয়েছেন। মাননীয় বিচারপতিদের এই আদেশ সরকারী পক্ষের কৌসুলীগণ উপেক্ষা ক'রে চলেছেন। দু'মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সরকারী পক্ষ পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমাদেরই মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তারজন্য প্রয়োজন সময়ের, অর্থের ও আমার হয়ে মামলা তদ্‌বির করার জন্য লোকের। কিন্তু আমি নিজেই তো এখন জেলে বন্দী। আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব, বিশেষ ক'রে সমীর বলতে গেলে প্রায় একাই খুব খেটে চেষ্টা-চরিত্র করছে বলেই আমার পক্ষে দীর্ঘ ছ'বছর ধরে মামলা চালাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। এখন সেই প্রচেষ্টা আরও দ্বিগুণ উৎসাহে যদি না চালানো যায়, তা হলে এই অচলাবস্থায় আশানুরূপ সমাধান সম্ভব হবে না। যদিও অগ্নিযুগের ছোট ভাইরা—মিহির, বনবিহারী, শচীন. অর্দ্ধেন্দু এবং চট্টগ্রাম বিপ্লবী সংগঠনের আমার ভাগনে ফটিক নানাভাবে মামলা চালাবার জন্য সাহায্য করছে। তবু আরও বেশী কি ভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের প্রচেষ্টার সমবেত রূপ দেওয়া যায় তাই ভাবছিলাম। এইসব চিন্তার জন্যই হয়ত আমার এই অবসাদ, অবসন্নতা ও ক্লান্তি। আজ আর বেশীক্ষণ জেগে থাকতে পারলাম না। বিছানায় শুয়েই দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম।

প্রায় প্রতি সকালেই আমাদের মামলাসংক্রান্ত বিষয়ে প্রস্তুতির জন্য অন্য সেল-ইয়ার্ড থেকে আমাকে সাহায্য করতে আমার সহবন্দীরা

আসে। যথারীতি তারা আজও এসেছে। আমি টেবিলের ওপর মামলার কাগজপত্র সাজিয়ে বসেছিলাম। আজ আমাদের ইচ্ছা ছিল কয়েকজন বিশেষ সাক্ষীকে জেরা করার জন্য প্রশ্ন সাজাবার। কিন্তু আজ আর আমাদের তা করা হল না। আমার এই তরুণ বন্ধুরা গতকাল শ্রীমতী ঊষারাণীকে দেখে এসেছে এবং কেউ কেউ ফুলের তোড়া প্রভৃতি নিয়ে তাকে অভিনন্দনও জানিয়ে এসেছে। তবে তাদের ঔৎসুক্য তাতেও মেটে নি, কারণ আমাদের সাক্ষাৎকালে কিভাবে এবং কি কি বিষয় নিয়ে আমার আর ঊষার মধ্যে আলোচনা হল সেটিই তাদের জানার ও শোনার খুবই ইচ্ছে ছিল। সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য সবারই চোখেমুখে ফুটে উঠেছে আপসোসের চিহ্ন। এই সাক্ষাৎকারের সময় যদি তার সব কথা শুনতে পারত এবং বিশেষ ক'রে আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশসমূহ দেখার সুযোগ পেত, তবে হয়ত তারা আমাদের এই সাক্ষাৎকার নিয়ে আর কোনো কথাই বলত না। যেহেতু গতকাল তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নি—অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের কথোপকথন শুনতে পায় নি ও আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তিসমূহ লক্ষ্য করার সুযোগ পায় নি, তাই তাদের এখন বিশেষ ইচ্ছা আমি যেন এই সাক্ষাৎকারটির পূর্ণ-বিবরণ তাদের পরিবেশন করি।

আমি তাদের নিরাশ করতে পারলাম না। যতটুকু সম্ভব একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাদের দিলাম। আজ যারা এখানে উপস্থিত আছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ শ্রীমতী ঊষারাণীকে গতকাল দেখতে যাবার সুযোগ পায় নি, কারণ তাদের 'ইন্টার ভিউ' ছিল না। তারা আমাকে প্রশ্ন করল—আমার বইতে শ্রীমতী ঊষারাণীর যে বিবরণ দেওয়া আছে তার সঙ্গে পঞ্চান্ন বছরের প্রৌঢ়া ঊষারাণীর কি আজ কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়? আমি তাদের বললাম, আমার ১৯৪৬ সালের ছবি তোমরা কোনো বইতে নিশ্চয়ই দেখে থাকবে, আর ১৯৫৫ সালে

আমাকে যেরূপ দেখছ, তার মধ্যে তোমরা কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছ? এরপর আমি আমার লেখা "CHITTAGONG HEROES' FIGHT FOR FREEDOM" সম্বলিত 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার প্রথম দিনের পাতাটি দেখালাম। বিশেষ আকর্ষণের জন্য ঐ পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক এতে আমার একটি ফটো ও তদানীস্তন আই. জি. পুলিশ মি° লোম্যানের কাছে ধরা দিতে যাবার আগে আমি যে চিঠিটি লিখেছিলাম সেটি ছাপা ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম—১৯৫৫ সালের সেই ছবিটির সঙ্গে আমার বর্তমান চেহারার কি কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়? আর একটি ফটো ১৯৫৫ সালের নির্বাচনের আগে তোলা হয়েছিল। সেই ফটোটি একটি আবেদন পত্রে ছাপানো হয়। এই ফটোটির সঙ্গে আমার বর্তমান চেহারার কিছু মিল পাওয়া যায়। এত বছর আগেকার বালিকা ঊষারাণীর সঙ্গে আজকের প্রৌঢ়া ঊষারাণীর মিল থাকা নিশ্চয় সম্ভব নয়। তবে বর্তমানে তাকে দেখে এখনও মনে হয় আমার সেই বর্ণনা খুবই সঠিক ছিল।

আমাদের উপস্থিত সহবন্দীদের মধ্যে একজন পূর্বে আমার বইগুলির একটিও পড়ার সুযোগ পায় নি। এই জেলের লাইব্রেরীটি বেশ বড়ো এবং তাতে অনেক বইই আছে। সে বইটির প্রত্যেকটি খণ্ড জেল লাইব্রেরীতে থাকা সত্ত্বেও চেষ্টা করে এখনও পায় নি। সে ছাড়া আমার অন্য সহবন্দী কয়েকজন বন্ধুও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, পত্রিকায় প্রকাশিত বাহান্নটি পরিপূর্ণ পৃষ্ঠা আগে কোনো দিন দেখবে সুযোগ পায় নি এবং তারা জানতও না যে বর্তমানে সেগুলো আমার কাছে এখানেই আছে। তাদের মধ্য থেকে একজন আমার বই রাখার তাকের ওপর থেকে সেগুলো টেনে আনল এবং আমার প্রকাশিত লেখাগুলোর বিশেষ অংশ নিয়ে আমাকে কিছু প্রশ্ন করল। সামান্য সামান্য উত্তর দিয়ে আমি তাদের ঔৎসুক্য নিবারণের চেষ্টা করেছি। তারা বিশেষ ক'রে ছ'সাতটি পৃষ্ঠা বেশ মনোযোগের সাথে উল্টে উল্টে দেখছিল। এই পৃষ্ঠাগুলো হল—ফেণীতে পুলিশের হাতে আমাদের বন্দী হওয়া এবং আচম্বিতে

গুলি চালিয়ে তাদের আহত ক'রে পালিয়ে যাওয়া, সুরেনের বাড়িতে পোঁছানো, থাকা-খাওয়া এবং চৌদ্দগ্রাম থেকে কুমিল্লার দিকে যাওয়ার বিবরণ ও ছবি ছিল। আমি আমার বইতে আগে যা লিখেছি তা-তো তারা আমার মুখ থেকেই শুনল, কিন্তু গুলি চালিয়ে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে শ্রীমতী ঊষারাণীর বাড়িতে পৌঁছাবার আগে পর্যন্ত বিবরণ তারা আমার মুখে শুনতে চাইছিল। সেগুলো বলার একটুও ইচ্ছা আমার করছিল না। তবুও তারা আমার মুখে শুনতে চাইছিল। তারা আমার মুখে সব কথা শোনার জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। তাই সংক্ষেপে তাদের বললাম—

আমরা চারজন চট্টগ্রামের ডবল মূরিংস্ (Double Moorings) জেটির নিকটবর্তী একটি বাড়ি থেকে ২২ তারিখ বিকাল প্রায় চারটার সময় যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের ইচ্ছে ছিল আমরা কলকাতায় যাব। কিন্তু আমরা ঠিক করেছিলাম, চট্টগ্রাম মেন-স্টেশন ও তারপর পাহাড়তলি-স্টেশন আমরা ব্যবহার করব না। ভেবেছিলাম তারপরের স্টেশন ভাটিয়ারী থেকে কুমিল্লার টিকিট কাটব এবং পরে কুমিল্লা থেকে কলকাতার দিকে রওনা হব। আমাদের বেশভূষার কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল, আর প্রয়োজন ছিল সাধারণ যাত্রীর মতো কিছু জিনিসপত্র ও ছোট একটি বিছানা সঙ্গে রাখব। তাই সঙ্গে নিলাম ছোট একটি গাঁটরী, একটি ছোট বিছানা, একটি হারিকেন ও একটি ঘটি।

ভাটিয়ারী স্টেশন চট্টগ্রাম থেকে প্রায় আট মাইল দূরে। আমাদের ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে যেতে হবে। চট্টগ্রাম-কলকাতা ট্রেনটি বোধ হয় তখন ছাড়ত সন্ধ্যা আটটা নাগাদ। তাই আমাদের ইচ্ছে ছিল অন্তত আটটার সময় যেন ভাটিয়ারী স্টেশনে উপস্থিত হতে পারি। আমরা সেই মতো হিসেব ক'রে রওনা হয়েছি। ভাটিয়ারী পৌঁছানোর আগে বেশ সন্ধ্যা হয়ে গেল, কেননা আমরা খুব ধীরে ধীরেই হাঁটছিলাম। বাড়ি থেকে আমরা আগেই বেরিয়েছিলাম, কারণ চারটার পরে সেই

বাড়ির কর্তা অফিস থেকে ফিরবেন। তিনি তাঁরই বাড়িতে আমাদের উপস্থিতির কথা জানতেন না। তাঁর ছোট ভাই তাঁর অজ্ঞাতে সেখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিল। দু'দিন সেখানে অবস্থানের পরই আমাদের যাত্রা করতে হল এবং তাও করতে হল প্রায় দিনের বেলাতেই। সেই কারণে ধীরে ধীরে হেঁটে সময় কাটিয়ে ভাটিয়ারী স্টেশনে রাত আটটা নাগাদ পৌঁছব স্থির করেছি। পথে আমরা বিপদের সম্মুখীন হব না, সেইরূপ ভাবি নি। ট্রাঙ্ক রোডে বিপদের আশংকা আমরা আগে থাকতেই করেছিলাম, কারণ ভেবেছিলাম ছত্রভঙ্গ পুলিশ বাহিনীর কর্তারা ইতিমধ্যে বিভিন্ন থানা থেকে কিছু পুলিশ সংগ্রহ ক'রে ট্রাঙ্ক রোড পাহারা দেবার ব্যবস্থা করলেও করতে পারে। আমাদের আন্দাজ একেবারে ভুল হল না, একটি ভাড়া করা বাসে ক'রে পুলিশ ট্রাঙ্ক রোডে টহল দিচ্ছিল। আমরা একস্থানে আগে থেকেই লক্ষ্য করলাম যে, তারা রাস্তার ওপর বাস থামিয়ে বসে আছে। কিন্তু তখন ফিরে যাবার আর কোনো উপায়ই ছিল না। হঠাৎ যদি ঘুরে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করি তবে তাদের সন্দেহের উদ্রেক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই ক্ষেত্রে একমাত্র নিরীহ পথচারীর মতো অভিনয় ক'রে পাশ-কাটিয়ে যেতে পারলেই রক্ষা। আমাদের প্রত্যেকের কাছেই গুলিভরা দুটি ক'রে রিভলভার কোমরে বাঁধা, আর তার ওপরে শার্ট ঢাকা ছিল। সবসময় অযথা বিক্রম কোনো কাজেই লাগে না। সেখানে সফলতা নির্ভর ক'রে সাহস ও বিক্রমের ওপর নয়; তা নির্ভর করে অসীম দুঃসাহসিকতাকে অন্তরে পোষণ ক'রে নির্ভয়ে সরল সাধারণ গোবেচারা গোছের লোকের মতো অভিনয় করার ওপর।

সেই কারণে আমরা দু'জন দু'জন ক'রে ভাগ হয়ে গেলাম সন্দেহাতীত নিরীহ লোক প্রতিপন্ন করার জন্য লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে নিলাম। আরও নিরীহ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আমাদের মধ্যে আনন্দ গ্রাম্য সংগীত গাইতে লাগল। মাঝে মাঝে আমরা বিড়ি ধরিয়েছি—যদিও বিড়ি

বা সিগারেটের অভ্যাস আমাদের কারোই ছিল না। স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিড়ি বিনিময় করা হল। আমরা ডবল মু্যরিং জেটির কাছ থেকে যাত্রা শুরু করার সময়ই আমাদের সঙ্গে হারিকেন, ঘটি, বিড়ি ইত্যাদি নিয়েছিলাম। সেইভাবে আমরা যেন পুলিশের অস্তিত্ব বা বাসের মধ্যে পুলিশের উপস্থিতি সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন, তেমন ভান ক'রে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেলাম। তারাও আমাদের দেখে কোনোরূপ সন্দেহ করার অবকাশ পায় নি। যদিও আমাদের চারজনের সঙ্গে গুলিভর্তি আটটি রিভলভার সব সময়ই প্রস্তুত ছিল।

আমরা যখন পৌঁছালাম, তখন ভাটিয়ারী স্টেশনে খুব কম লোকজন ছিল। আমাদের দু'জন প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। মাখন ঘোষাল বুকিং অফিসে গিয়ে চারটি কুমিল্লার টিকেট চাইল। আমি তার সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু ভাটিয়ারী থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত টিকিট পাওয়া যায় না। লাক্সাম জংশন পর্যন্ত টিকেট কাটতে হয় এবং তারপর সেখান থেকে কুমিল্লার টিকিট পাওয়া যায়। অগত্যা আমাদের ভুল সংশোধনের পর চারটি লাক্সামের টিকিট কাটা হল। ভাটিয়ারীর মতো ছোট স্টেশনে স্টেশনমাস্টারই একাধারে বুকিং ক্লার্ক ও স্টেশনমাস্টারের কাজ ক'রে থাকেন। মাখন টাকা দিল এবং তিনি টিকিট দিলেন। কিন্তু আমাদের ঐরূপ অজ্ঞতার জন্য—লাক্সাম জংশনের টিকিট না চেয়ে সোজা কুমিল্লার টিকিট চাওয়াতে স্টেশন-মাস্টারের সন্দেহ হয়। যদিও তখন আমাদের বুঝবার কোনো সুযোগ হয় নি যে, তিনি কেবল স্টেশনমাস্টারই নন, পুলিশের ডিউটিও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে করছিলেন। আমাদের ভুলের জন্য তিনি আমাদের সন্দেহ করেছিলেন এবং আমাদের অজান্তে ফেনীতে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে টেলিগ্রাফ ক'রে লাক্সামের এই টিকিট চারিটির নম্বর এবং চারজন সন্দেহজনক লোক ট্রেনের যে কামরায় যাচ্ছে তার নম্বরও জানিয়ে সজাগ ক'রে দেন। এই স্টেশনমাস্টারটি এইরূপ ইংরেজ সরকারের

প্রতি আনুগত্য ও তাদের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতার কথা আমরা জানতে পারি যখন এই স্বনামধন্য স্টেশনমাস্টারটি সরকারের হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কোর্টে সাক্ষী দিতে এলেন।

আমরা ট্রেনে উঠলাম। এটি একটি তৃতীয় শ্রেণীর বড়ো কামরা। খুব বিবেচনা করে দরজার কাছে না বসে একেবারে ভেতর দিকে ভাগ হয়ে বসলাম ও পরে শুয়ে পড়লাম। দরজার কাছে না থাকার কারণ হল পুলিশ হঠাৎ আক্রমণ করলে যেন প্রস্তুত হওয়ার একটু সময় পাই। আমাদের গাড়ি লাক্‌সাম গিয়ে পৌঁছবার আগেই যখন ফেণী স্টেশনে থামল, তখন দু'এক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ সদলবলে এসে সেই ট্রেন-কম্পার্টমেন্টে ঢুকল। তাদের মধ্যে একজন ইন্‌স্‌পেক্টার, একজন হাবিলদার ও দশ বারোজন কনেস্টবল ছিল। পুলিশের মধ্য থেকে বোধহয় সাব-ইন্‌স্‌পেক্টারটিই চেঁচিয়ে বলছিলেন, একসঙ্গে কোন চারজন আপনাদের মধ্যে লাক্‌সাম যাচ্ছেন? সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের চোখ গাড়ির সবাইকে দেখতে লাগল। আমাদের চারজনকে আবিষ্কার করতে তাদের খুব কষ্ট পেতে হয় নি। তারা আমাদের একেবারে সামনে এসে টিকিট চাইল। আমাদের টিকিট দিতে হল। ভাটিয়ারী থেকে চারটি লাক্‌সামের টিকিট তারা দেখতে পেলেন এবং আমাদের মধ্যে শ্রীগণেশ ঘোষ নানাভাবে অভিনয় ক'রে আমরা যে একেবারে নিরীহ লোক, তা বোঝাতে চেষ্টা করল। তাদের সন্দেহ থাকলেও আমরা যে সাধারণ ও নিরীহ লোক নই, সে বিষয়েও তারা নিশ্চিত হতে পারে নি। কারণ আমাদের বেশভূষা, সঙ্গের লণ্ঠন, পৌঁটলা বিছানা, ঘটি প্রভৃতি দেখে আমাদের নিরীহ বলেই তারা ধারণা করেছিলেন। আর এই কারণেই তারা আমাদের চকিতে ঝাপটে ধরে নি। আমরা একটুখানি সময় পেলাম, কিন্তু নামতে আমাদের হলই। পুলিশদল আমাদের ঘিরে নিয়ে চলেছে স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে। ফেণী স্টেশনটি বেশ বড়ো। ওভারব্রিজও আছে। যে কামরাটি থেকে আমরা নেমেছি সেখান থেকে স্টেশন ঘরটি প্রায়

একশ' গজ দূরে। এইটুকু পথ চলাকালে যেটুকু সম্ভব তারই মধ্যে প্রস্তুত হতে হবে। প্রস্তুত হবারও বা এমন আর কি আছে? কোমরে বাঁধা গুলি-ভর্তি আটটি রিভলভার ও পিস্তল আমাদের চারজনের কাছে আছে। তবু আবার প্রস্তুত হবার কি থাকতে পারে? অভিজ্ঞতা না থাকলে এইরূপ অবস্থায় শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি কি, তা বোঝা খুবই শক্ত। রিভলভার তো আছে, তাতে কি প্রস্তুতির সব হয়ে গেল? সেগুলো প্রত্যেকেরই কোমরে গোঁজা আছে। শার্ট দিয়ে সেগুলো ঢাকা। খুব সুকৌশলে ম্যাজিকের মতো দর্শকের বোঝার আগেই যদি তা আমরা বের করে হাতের মুঠোতে ধরে ট্রিগারে আঙুলে রেখে তৈরী হতে না পারি তবে আসলে তা কোনো প্রস্তুতিই হল না। রিভালভার গুলি-ভর্তি থাকলেও তা কোনো কাজেই আসবে না। হাতের মুঠোতে রিভলভার নেওয়াটা সম্ভব হচ্ছে কি ভাবে? পুলিশের দল ঘিরে আছে। তাদের অতগুলো চোখ সজাগ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। যদি তারা কোনোমতে একটুও সন্দেহ করে বসে যে, আমরা রিভলভার বার করতে চেষ্টা করছি, তবে তারা আমাদের সেই সুযোগ কোনোমতেই দেবে না, তার আগেই আমাদের হতে হবে তাদের শিকার।

এইটি ছিল সেই মুহূর্তের প্রধান সমস্যা—কি ক'রে তাদের বুঝবার আগেই একেবারে ট্রিগারে আঙুল রেখে মুষ্টিবদ্ধ পিস্তল নিয়ে প্রস্তুত হব? হেঁটে চলেছি। চলতে চলতে কাশছি। কাশির সঙ্গে সাধারণ অঙ্গভঙ্গিও করছি। সেইরূপ মানানসই অঙ্গভঙ্গির সুযোগে একটু একটু ক'রে কোমরের রিভলভারগুলো ঠিক ক'রে নিচ্ছিলাম, যাতে হঠাৎ টান দিয়ে বার করার সময় কাপড়ে জড়িয়ে না যায়। মুহূর্ত গুণছিলাম কখন তারা আমাদের শরীর তল্লাসী ক'রে পিস্তল-রিভলভারগুলো বার করার চেষ্টা করবে। সে সুযোগ তাদের আমরা দেব না। আর তারাও আগে সন্দেহ করলে আমাদের সে রকম সুযোগ নিতে বাধা দেবেই। এই অবস্থায় কেবল সাহস ও বিক্রমের পাল্লা দেওয়া নয়,

পুলিশের বেষ্টনীর মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়ে ধীর মস্তিষ্কে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ ক'রে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়াই এই উপস্থিত বিপদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়।

স্টেশনমাস্টারের ঘরে তারা আমাদের নিয়ে এলো। সাব-ইনস্‌পেক্টার ও ইনস্‌পেক্টার চেয়ারে ও টেবিলে বসলেন। স্টেশন-মাস্টারের ঘরে প্রবেশ করার সময় দেখলাম সামনে লাইনের ওপরে ট্রেনভর্তি গুর্খা সৈন্য। আমরা আমাদের মামলা চলার সময় সরকারী সাক্ষীর মুখে শুনেছিলাম আগরতলার মহারাজের সৈন্য বিলোনিয়া যাওয়ার জন্য সেইরাত্রে সেখানে অপেক্ষা করছিল। আর সুরেনের কাছেও শুনেছিলাম, আগরতলার মহারাজের সৈন্য আমি সেখানে যাওয়ার একদিন আগে তাদের ছাউনি ফেলেছে।

কিরূপ ভয়ানক ও শোচনীয় অবস্থা!—চারিদিকে সজাগ পুলিশ, স্টেশনের সামনের লাইনে গুর্খাসৈন্যবাহী ট্রেন। সাব-ইনস্‌পেক্টারটি খুবই তৎপর হয়ে উঠলেন, বেশী সময় আর তিনি অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে চাইলেন না। আমাদের প্রত্যেককে তার তল্লাসী করতে হবে। তিনি তখন যদি বুঝতেন যে তল্লাসী করলে তাদের সমূহ বিপদের মধ্যে পড়তে হবে, তবে হয়ত বা শরীর তল্লাসীটা তিনি করতেন না; অথবা তল্লাসীর কথা না বলে হঠাৎ আমাদের জাপটে ধরে রিভলভার-পিস্তলগুলো আগেই ছিনিয়ে নিতেন। কিন্তু আমাদের আগাগোড়া সার্থক অভিনয়ের জন্য তারা হয়ত ভেবেছিল—আমরা নিরীহ লোক হলেও হতে পারি। তারা যে সাময়িকভাবে হলেও বিভ্রান্ত হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। এতে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না যে, তাদের সেটুকু বিভ্রান্ত করাও আমাদের পক্ষে কৌশলগত জয়।

আমাদের মধ্যে প্রথমে মাখন ঘোষালকে ডাকল এবং তার শরীর তল্লাসী করতে একজন সিপাই উদ্যত হল। সিপাইটি তল্লাসী করার জন্য মাখনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—আর একটি মুহূর্তের ভগ্নাংশ মাত্র বাকি। একেবারে শেষ মুহূর্তের সর্বশেষ প্রান্তে এক সেকেণ্ডের

শতাংশ সময়ও অপেক্ষা করা চলে না। চকিতে আমি পিস্তল ও রিভলভার হাতের মুঠোতে নিয়ে আমার পিছনের সেপাইয়ের জানুদেশ লক্ষ্য ক'রে গুলি চালালাম এবং তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎবেগে লাফ দিয়ে টেবিলে উঠবার মুখেই আর একটি কনেস্টবলের দিকে গুলি ছুঁড়লাম। সেই সঙ্গে তারা আমার গর্জন শুনল—"ভাগ যাও—হাটো হিঁয়াসে।" এই দুটি পিস্তলের আওয়াজ শোনার সাথে সাথেই যে যেখানে পেরেছে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে—আমার 'ভাগো', 'হাটো' বোধহয় তাদের কানে গিয়ে তখনও পৌঁছায় নি। য: পলায়তি স জীবতি! তাদের যার যেদিকে চোখ গেছে, সে সেদিকে ছুট দিয়েছে। আমরাও দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম। আমরা কার পেছনে কে ছিলাম বা কে কার সঙ্গে আছি, তা তখনও বুঝতে পারি নি। দরজার পাশে আচম্বিতে আক্রমণ করার জন্য কারো লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনাকে স্মরণ রেখেই আমি আমার শিক্ষা ও অভ্যাস অনুযায়ী ধীরে ধীরে দরজা অতিক্রম করাটাকে অনুচিত ব'লে মনে করলাম এবং বিদ্যুৎবেগে লাফ দিয়েই স্টেশনঘর থেকে বেরিয়েছিলাম। সিপাইরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গিয়েছিল, তাই সেখানে দরজার আড়ালে পজিশন নেওয়া তাদের পক্ষে হয়ে ওঠে নি। আমি কিন্তু এই ধরনের আচম্বিতে আক্রমণ আসার সম্ভাবনাকে মাথায় রেখেই প্রস্তুত ছিলাম। তাই আমি যেমনি লাফ দিয়ে বেরিয়েছি, তখন খাকী পোশাকে একজনকে দেখতে পেলাম। বোধহয় তিনি সেই সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার ভদ্রলোকটি হবেন। আমি আমার বাঁ হাতের পিস্তলের ট্রিগারে চাপ দিলাম এবং গুলিটি বোধহয় তাঁর গায়ে লাগল —তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। আমার অনুমান যে সঠিক, তা জানতে পেরেছিলাম আমাদের মামলা চলাকালে। সাব-ইন্‌স্‌-পেক্টারটি হলেন যতীনবাবু, আমাদের সহকর্মী হারাণের মামা আর ইন্‌স্‌পেক্টারটি ছিলেন জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক।

আমার রিভলভার কোনো দিনই যে পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট

ছিল না, তার প্রমাণ সেদিনও দিল। তাঁরা দু'জন পুলিশ অফিসার যখন জেলে আমাকে সনাক্ত করার জন্য গিয়েছিলেন, তখন তাঁরা কেউই আমাকে দেখেছেন ব'লে দাবী করেন নি। আসলে কিন্তু তাঁরা দু'জনেই আমাকে খুব ভালোভাবেই চিনতে পেরেছিলেন। তাঁদের এই দরদী মনোভাবের একটি কারণ হল, তাঁরা আমাদের যুববিদ্রোহকে সহানুভূতির চোখে দেখেছেন। আর দ্বিতীয় কারণ আমার মনে হয়েছিল তাঁরা বুঝেছিলেন যে, কাউকে মেরে ফেলার জন্য গুলি চালাই নি এবং আমি হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদও করি নি। বিনা প্রয়োজনে কাউকে হত্যা বা আহত করার জন্য আমি একটিও গুলি চালাই নি, কেবলমাত্র পুলিশদের ভীত সন্ত্রস্ত ও ছত্রভঙ্গ করার জন্য আকাশের দিকে মুখ ক'রে আর কতগুলো ফাঁকা আওয়াজ করেছিলাম। যতীনবাবুর তলপেটে গুলি লাগে। আমি আমার বাঁ-হাতে ধরা পিস্তল দিয়ে গুলি করেছিলাম। তিনি আমার বাঁ দিকে মাত্র তিন-চার হাত দূরে ছিলেন। বোধহয় স্টেশনমাস্টারের ঘরের গরাদহীন বড়ো জানলা দিয়ে তিনি প্ল্যাটফর্মের ওপর বেরিয়ে এসেছিলেন আর ঠিক সেই সময়েই আমি পাশের দরজা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে এসে পড়েছি। অন্ধকারে খাকী পোশাক পরা একজনকে সেখানে দেখা মাত্রই তাঁকে কোনোরূপ সুযোগ না দিয়েই এবং গুলি ছোড়াটা উচিত মনে করেই নিমেষের মধ্যে আমি তাঁকে গুলি করি।

গুর্খা সৈন্যবাহী ট্রেনটির দিকে মুখ ক'রেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে ছিলাম। আমি আমার বাঁদিকে যতীনবাবুকে গুলি করেই ডানদিকে ছুটলাম। অন্ধকারে মনে হল আমার সামনে মাখন ও আনন্দ দৌড়চ্ছে। তাদের কিছুদূর পর্যন্ত অনুসরণ করার পর বুঝলাম আমার ভুল হয়েছে—তারা কেউই আনন্দ অথবা মাখন নয়। আমি একেবারে সঙ্গীছাড়া হয়ে পড়লাম। আমি স্টেশনের চত্বর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য ডান দিকে, অর্থাৎ গুর্খা সৈন্যবাহী ট্রেনের ঠিক উল্টো দিকে বেশ দ্রুত বেগে অগ্রসর হচ্ছিলাম। স্টেশন চত্বরটি কাঁটাতারের

বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। আমি না দেখতে পেয়ে কাঁটাতারের বেড়ার ওপরেই গিয়ে পড়লাম। কাঁটাতারে আমার জামাকাপড় সব গেল জড়িয়ে। তারের ফাঁক দিয়ে গলে কম্পাউণ্ডের বাইরে যাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম। তারের কাঁটায় আমার শরীরের বহুস্থান কেটে-ছিঁড়ে গেল—মাথায় একটি জায়গায় গভীর ক্ষত হয়। কাপড়জামা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়েছে। তবুও নিজেকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত ক'রে নেবার জন্য মারলাম এক হ্যাঁচকা টান আর তাল সামলাতে না পেরে পড়লাম গিয়ে এক পাঁকভর্তি ডোবায়।

এ-এক অবর্ণনীয় অবস্থা! পিস্তল ও রিভলভার দু'হাতে ধরে হাত দু'টি সোজা উঁচু ক'রে রাখতে হল। পাঁক খুব ঘন আর ডোবাটিও বেশ গভীর। মনে হয়, নিশ্চয়ই কোনো মাটির দালান তৈরী করার জন্য এই পাঁকের ব্যবস্থা। এ নিয়ে অবশ্য তখন কোনো চিন্তাই করি নি আর সেটি গবেষণা করার মতো উপযুক্ত অবস্থাও ছিল না। আমি প্রাণপণে কাদার গর্ত থেকে উঠবার চেষ্টা করছিলাম আর যতই চেষ্টা করছি ততই আমার পা পিছলে পিছলে আমাকে আরও গভীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। পা ঠিক রাখাই যাচ্ছে না—তবে আর কিসের ওপর ভর দিয়ে উঠব। ধরে ওঠা বা ভর দিয়ে ওঠার মতো কোনো কিছুই সেখানে ছিল না—সে এক নিদারুণ অবস্থা। ডোবা বা খাদটি কতখানি গভীর তা তো আমার জানা নেই। যদি পা পিছলে আরও গভীরে চলে যাই তবে যে সেখানেই জীবন্ত সমাধি। উপায় কি? হাতের কাছে এমন কিছুই নেই যার ওপর ভর দিয়ে উঠব। এ এক প্রাণান্তকর অবস্থা! তারপর আর জানি না, আজও বলতে পারব না, কি ভাবে সেই কাদা মাটির ডোবা থেকে আমার উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। যতদূর স্মরণ করতে পারছি, তাতে মনে হয় আমি সর্বশক্তি দিয়ে আমার সমস্ত মাংসপেশী ও প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সক্রিয় ক'রে একই সঙ্গে পরিচালিত করলাম। কোন অঙ্গ কি কাজ করেছিল আর কোন মাংসপেশী কি কাজে লেগেছিল,

তা আমি জানি না। আমার হাত দু'টো শুধু রিভলভার ও পিস্তল-সমেত সোজা উঁচু ক'রে রেখেছিলাম। আমি সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সমস্ত শরীর—আমার আপাদমস্তক কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ও প্রচণ্ড জোরে বোধহয় ঝাঁকুনি দিয়েছিলাম। এ ছাড়া আমি আর কিছু বলতে পারব না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কাদামাটি মাখানো শরীর নিয়ে একটি জ্যান্ত ভূত সেজে সেই পাঁকের ডোবা থেকে নিজেকে উদ্ধার করলাম।

আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে যে সেই গভীর রাত্রে সেখানে কোনো জনপ্রাণীই ছিল। রাত তখন প্রায় দু'টো হবে। স্টেশন থেকে একটু দূরে শহরের মধ্যে অভয় আশ্রম—সেই আশ্রমের অধিকর্তা, শ্রীনির্মলচন্দ্র সিংহরায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু এত রাত্রে তাঁকে বা সেই আশ্রমের আর অন্য কাউকে পাওয়া গেল না। এখন ভাবছি সেখানে কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়াটা বোধহয় ভালোই হয়েছিল। তা না'হলে ফেণীর 'সেই মেয়েটি'কে নিয়ে জীবনের এই বাস্তব নাটকটি আর লেখা হ'ত না। আমি অভয় আশ্রম থেকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলাম। তারপর ফেণী টাউনের দিকে না গিয়ে পশ্চিম দিকে পাহাড় লক্ষ্য ক'রে চলতে লাগলাম। পাহাড় অঞ্চলে যা য়ার আগে আমাকে আবার স্টেশনের উত্তরে রেল-লাইনের ওপরে আসতে হল। কারণ, লাইনের পশ্চিমে বিস্তীর্ণ মাঠের অপর প্রান্তে প্রায় পাঁচ-ছ'মাইল দূরে পাহাড়ের অবস্থিতি দৃষ্টিগোচর হয়। আমি যখন প্রায় আধ-ঘণ্টার মধ্যে আবার স্টেশনের কাছে লাইনের ওপরে এসে দাঁড়ালাম, তখন স্টেশন ঘরটি খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কারণ সেখানে আলো ছিল, তবে অবশ্য সেটা বিজলী বাতি নয়। সেখান থেকে আমার অবস্থানটি দেখে ফেলার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, কারণ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সে স্থানটি ছিল ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। স্টেশনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে আমার যা মনে হয়েছিল, তাতে বুঝেছিলাম চাঞ্চল্যকর

ঘটনাটি ঘটে যাবার পর এখন সব শান্ত ও প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আমার উৎকণ্ঠা মেটানোর জন্য বিশেষ ক'রে জানার প্রয়োজন ছিল আমাদের মধ্যে সেখানে কেউ ধরা পড়েছে কি না। দেখেশুনে যা বুঝলাম, তাতে সেরূপ কোনো আশংকার কারণ ছিল ব'লে মনে হল না।

আমি মাঠে নেমে এলাম। প্রায় মাইলখানেক এগিয়ে যাবার পর একটি ছোট্ট জলা-জায়গা পেলাম। সেই জলে আমার গা-হাত-পা যতদূর পারি ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করছি। আমার কাটা ঘা-গুলোতে কাদা মাটি ঢোকার জন্য বেশ জ্বালা করছিল। ধোয়ার সময় আরও বেশী জ্বালা করতে লাগল। তখনকার মতো যতটুকু পেরেছি নিজের কাদামাটি মাখা ভূতের মতো চেহারাকে মানুষের মতো করবার চেষ্টা করেছি। তখন বোধহয় রাত তিনটে হবে। আমাকে অন্তত ঘণ্টা দুই, অর্থাৎ ভোর পাঁচটার মধ্যে দূরে পাহাড়ে গিয়ে একটু আশ্রয় নিতে হবে। কাজেই খুব কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও দ্রুত হাঁটতে চেষ্টা করলাম।

পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছালাম। পাহাড়টি খুব উঁচু নয়। ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল ও ছোট-বড়ো নানা আকারের গাছ ছিল। সেখানে যে সব পাহাড় দেখছি সেগুলো শ্রেণীবদ্ধ পাহাড় নয়—প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা। তখনও সেই পাহাড়ের আশেপাশে কোনো লোককে দেখতে পাই নি। আমি পাহাড়ের ওপরে উঠলাম। বসার মতো একটি স্থান খুঁজে নিয়ে বসে পড়লাম। খুব ক্লান্তি অনুভব করছিলাম। বসে থাকতে পারলাম না, শুয়ে পড়লাম। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়েও পড়েছিলাম। উঠে দেখি সূর্য উঠেছে—সকাল হয়েছে। বেশ দূর থেকে লোকজনের কণ্ঠস্বরও ভেসে আসছিল। পাহাড়ের ওপর বসে থাকলেই আমার সমস্যার সমাধান হবে না। নিচে নেমে আসতে হবে। পেতে হবে কোনো একজন দরদী মানুষের সন্ধান এবং তার কাছ থেকে সাহায্য না পেলে শেষপর্যন্ত আমার নিরাপদ স্থানে পৌঁছানো হয়ত সম্ভব হবে না।

এইজন্য তখন আমার প্রথম প্রয়োজনীয় কাজ হল আমার বেশ-ভূষার পরিবর্তন। ভাষা এবং হাবভাবও অবস্থানুগ ক'রে না নিলে নয়। আমার রক্তমাখা দেহ ও ছিন্নভিন্ন ভেজা কাপড়জামা দেখলেই লোকের মনে নানা সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে, আর সেটাই হবে আমার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। সেই কারণে আমি ঠিক করলাম লজ্জা নিবারণের জন্য একটি কৌপীন ছাড়া শরীরে আর কিছুই রাখব না। সম্ভব নয় বলে, নইলে একেবারে উলঙ্গ নাগা-সন্ন্যাসী হতে পারলে ভালো হ'ত। একেবারে নাগা সাজতে না পারার কারণ আমার সঙ্গে ত্রিশটি টাকা ছিল। যেটি একটি পুঁটলি ক'রে শরীরের সঙ্গে লুকিয়ে রাখার জন্য অন্তত একটি কৌপীনের প্রয়োজন—তাই আমি কৌপীনধারী জনৈক অর্ধপাগল লোক।

আর একটা কথা এখনও বলা হয় নি। আমি যখন মাঠের ওপর একটি ক্ষুদ্র জলা-জায়গায় দাঁড়িয়ে জল দিয়ে আমার গা-হাত-পা ধুচ্ছিলাম, আমি দেখলাম আমার পিস্তলের ইজেক্টারটি ভেঙে গেছে এবং পিস্তলটি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়েছে। আর দেখলাম রিভল-ভারটিতে অবশিষ্ট আছে মাত্র একটি গুলি। আমি সবসুদ্ধ রিভলভার থেকে পাঁচটি ও পিস্তল থেকে মাত্র একটি গুলি চালিয়েছিলাম। এখন মাত্র একটি গুলি সম্বল ক'রে পুলিশের মোকাবিলা করতে যাওয়া হবে আমার পক্ষে ধৃষ্টতার সামিল। এইরূপ একটি শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হব, তা আগে ভাবি নি। আমি ভাবতেই পারছিলাম না যে মাত্র একটি গুলি চালাবার পর আমি হয়ত বন্দী হব, আর পুলিশ বাহাদুরি নেবে অনন্ত সিং-কে একটি পিস্তল ও একটি রিভলভারসহ জীবন্ত বন্দী করেছে বলে প্রচার ক'রে। একবার একটু মনেও হয়েছিল ঐ জলা-জায়গায় অস্ত্র দু'টি ফেলে দিই। রাত্রেই পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যাবে, তাই অস্ত্র দু'টি সঙ্গেই রেখে দিই। আর আখরে কি করব তা নিয়েও সঠিক সিদ্ধান্তে তখনও উপনীত হই নি। এখন যে পাহাড় থেকে নেমে আসতে হবে তাই এই

অস্ত্রগুলো সম্বন্ধে মনস্থির করার অনন্তকাল সময় আমার জন্য বসে নেই। আমি ঠিক করলাম আমার সর্বক্ষণের বিশ্বাসী সঙ্গী—এই পিস্তল ও রিভলভার দু'টিকে এখন বিদায় দেব। একটু নরম জায়গা বেছে নিয়ে গাছের শুকনো ডালের ছোট একটি টুকরো দিয়ে নিজের হাতে সেখানে একটি গর্ত খুঁড়ে আমার চিরসঙ্গী পিস্তল ও রিভলভার দু'টির জন্য সেই নির্জন পাহাড়ের ওপর সমাধি রচনা করি। সেই স্থানে সে দুটিকে পুঁতে রাখা যদিও বিশেষ কিছুই নয়, তবুও আমার পক্ষে তা খুব সহজ ছিল না। আগ্নেয়াস্ত্র দুটি শুধু যে আমার সর্বক্ষণের সহায় ছিল, তা নয়, তারা যে সব সময় আমার অতি আপনার—অতি প্রিয় ও অতি বিশ্বস্ত বন্ধু। তারা আমার প্রতি কোনো দিনই অকৃতজ্ঞ হয় নি। পুলিশের সঙ্গে নাগারখানা পর্বত-যুদ্ধে বীরমোহন ও আলি হোসেনের দুটি বন্দুক অতি নিকট থেকে আমাদের বুক লক্ষ্য ক'রে গর্জে ওঠার আগেই আমার প্রিয়সাথী—রিভলভারের গুলি বিদ্ধ হয়ে তারা পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ল। পুলিশ লাইনের সান্ত্রীর বন্দুক তার কাঁধে যেমন ছিল তেমনি রইল, আমার অনুগত পিস্তলটির গুলি মরণালিঙ্গনে তাকে অভিনন্দন জানাল। আমার বিশ্বাসী ও অনুগত সাথী রিভলভার আমার বিরুদ্ধে কখনও বিদ্রোহ করে নি। পরোইকোরা রাজনৈতিক ডাকাতির সময় আমার রিভলভার কেবলমাত্র মহাজন সরসীবাবুর উরুদেশে লক্ষ্যভেদ করেই ক্ষান্ত হয়েছে—আমার আদেশ মেনে নিয়েছে—বেপরোয়া হয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় নেয় নি। আমারই অশেষ আস্থাভাজন রিভলভার প্রকাশ্য দিবালোকে সকাল দশটার সময় অফিসের সামনে আসাম বেঙ্গল রেল-কোম্পানীর গাড়ি আটকে টাকা লুট করার সময় একটুও বিদ্রোহ করে নি—কেউ আহত হল না, বেরুলো না একটি গুলি। আমার প্রতি রিভলভার পিস্তলের বন্ধুত্ব, তাদের আনুগত্য ও তাদের সক্ষমতাকে কি আমার পক্ষে এত সহজে উপেক্ষা করা সম্ভব। তবু হায়! হে বন্ধু বিদায়!

নিজের হাতে গর্ত ক'রে তাদের চিরনিদ্রায় শয়নের ব্যবস্থা

করলাম। সেই মাটির শয্যার ওপর সযত্নে তাদের রেখে মাটি চাপা দিলাম। এতটুকু বৃত্তান্ত শোনার পর আজকে আমার সেলে উপস্থিত বন্ধুদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করল—"কোনো মতেই কি সেগুলো আপনার সঙ্গে রাখা সম্ভব হ'ত না ?"

খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন। আমি একটু হেসে উত্তর দিলাম : আমার অভিধানে অসম্ভব ব'লে কিছু তো লেখা নেই ভাই। আপাতত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে মাত্র একটি কৌপীন যার সম্বল, সে কি ক'রে দৃষ্টির অগোচরে অস্ত্র দু'টি তার সঙ্গে রাখবে ? মনে হতে পারে আমার সেইরূপ প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় অস্ত্র দু'টি লুকিয়ে রাখা বাস্তবে অসম্ভব ছিল। চিন্তা করলে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। যেমন নাকি এইরূপ উদ্‌ভ্রান্ত ও নগ্নবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অস্ত্র দু'টির অস্তিত্বের বাহ্যিক প্রকাশের কোনোরূপে সম্ভাবনাই না রেখে ইচ্ছে করলে গাছের বড়ো বড়ো পাতা, কচি কচি ডালপালা, ঘাস প্রভৃতি দিয়ে নিশ্চয়ই একটি পৌটলা তৈরী করা আমার পক্ষে খুব কঠিন ছিল না। সেই সঙ্গে ধরো, গাছের পাতা দিয়ে একটি মালা তৈরী ক'রে গলায় ঝোলাতাম এবং মানানসইভাবে আর কিছু লতাপাতা অন্য হাতে বা সেই হাতেই নিতাম। এই ধরনের বহু কিছুই বুদ্ধি ও বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার করা খুব একটা মুশকিলের ব্যাপার হ'ত ব'লে মনে হচ্ছে না। তবে প্রশ্ন হল এতসব বুদ্ধি খাটিয়ে, পরিশ্রম ক'রে সেই অস্ত্র দু'টি রাখার কি খুব প্রয়োজন ছিল ? মনে মনে মোট হিসেব ক'রে দেখছিলাম—পিস্তলের ইজেক্টার যখন ভাঙা, যখন রিভলভারটিতে একটি মাত্র কার্তুজ আছে, তখন কি এইরূপ অবস্থায়ও অস্ত্র দু'টি আত্মরক্ষার প্রয়োজনে একেবারে অপরিহার্য ? তাই নিজের বুদ্ধি দিয়ে দ্বিধাহীন সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এই ক্ষেত্রে মানসিক ভাবপ্রবণতা হবে একটি মারাত্মক অপরাধ ; বরং তার পরিবর্তে ছল-চাতুরী ও সময়োপযোগী বলিষ্ঠ ও সার্থক অভিনয়ই হবে আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

অতএব আমি ঠিক করলাম আমাকে বোবা-কালা-হাবা ও ছিট্‌গ্রস্ত লোকের মতো আগাগোড়া অভিনয় ক'রে যেতে হবে। যদি বোবার ভান না করি, তবে আমার কথা শুনে লোকেরা ধরে ফেলবে যে আমি সেই এলাকার লোক নই। কালা সাজার প্রয়োজন অনুভব করেছি এই কারণেই যে, দরকার মতো শুনব, আর না হলে কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছি না তেমন ভান করব। একেবারে উন্মাদ সাজলে সেটা হবে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনা। পাগলকে যদি লোকেরা আশংকাজনক মনে করে, তবে নিরাপত্তার জন্য জনসাধারণই তাকে ধ'রে পুলিশের হাতে জমা ক'রে দিতে পারে। তাই সংযতভাবে সামান্য পাগলামির ভান এবং হাবাগোবার মতো অভিনয় করার কথাই ঠিক করেছিলাম।

তখন সকাল প্রায় ন'টা কি দশটা হবে। এপ্রিল মাস। খুব গরম পড়েছে। আমার নগ্ন শরীর সূর্যের তাপে যেন পুড়ে যাচ্ছিল। কাল রাতে স্টেশনে গুলি চালাবার পর বহুপথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছি। খুবই ক্লান্ত। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছি। গলা বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের নিচে নামলাম। এরপর আবার সমতল ভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। কিন্তু সেখানে কোথাও আমি জলের সন্ধান পেলাম না। আশেপাশে কোনো ঘরবাড়ি নেই। দূরেও কোনো লোকালয়ের চিহ্ন মাত্র চোখে পড়ছিল না। পাহাড়ের এই সমতলভূমি খুবই বিস্তীর্ণ। একটি বড়ো গাছও আমার চোখে পড়ল না, যার তলায় বসে একটু বিশ্রাম নিতে পারি। সূর্যের প্রখরতা ক্রমেই বাড়তে লাগল। এখন বেলা প্রায় বারোটা। সূর্য একেবারে মাথার ওপর। যেন গলিত সূর্যরশ্মির ধারা আমাকে পুড়িয়ে ফেলতে চাইছে। তৃষ্ণা, ভীষণ তৃষ্ণা! বুক ফাটা তৃষ্ণার জ্বালায় আমি যেন আর চলতে পারছিলাম না। এক বিন্দু জলের জন্য নবাব আলীবর্দী খাঁ বাংলার মসনদের বিনিময়ে করুণ ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছেন—সেই দৃশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে

দেখেছি কিন্তু তৃষ্ণার প্রচণ্ডতা যে কি নিদারুণ, যার জন্য নবাব আলীবর্দী খাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবরুদ্ধ হয়ে জলের অভাবে তৃষ্ণা মেটাতে একবিন্দু বারির বিনিময়ে বাংলার মসনদ দিয়ে দিতে হচ্ছিল, তা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে বসে একটুও অনুভব করতে পারি নি। তৃষিতকণ্ঠের যে কি ভীষণ জ্বালা তার বাস্তব অনুভূতি সেইদিন ফেণী পাহাড়ের সেই মালভূমি অতিক্রম করার সময় বুঝেছিলাম। কে এক ফোঁটা জল দেবে, তার জন্য জোরে জোরে চিৎকার ক'রে ডাকতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সেই জনপ্রাণীহীন জায়গায় কে দেবে সাড়া, কে আমায় একবিন্দু জল দিয়ে সাহায্য করবে। আমি ঘাস চিবোতে গেছি, কিন্তু সেখানে কাঁচা ঘাসেরও অভাব। আর যেন দাঁড়ানো যাচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল সমস্ত শরীর এক্ষুনি যেন ভেঙে পড়বে। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল। মাঝে মাঝে চোখে সবকিছু যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। মুহূর্তে মনে হল, আমি যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ব। মূর্ছা যাবার পূর্বমুহূর্তে মানুষের যেরূপ অবস্থা হয়, আমার অবস্থা তখন সেইরূপ। দাঁড়িয়ে থাকা আর একেবারেই সম্ভব হচ্ছিল না—হাত-পা ছড়িয়ে একটি মূলোৎপাটিত বৃক্ষের মতো পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। যদি সেই অবস্থায় সেখানে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যেতাম, তবে সেইদিন হয়ত আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। কারণ কারো কাছে কোনো রকম সাহায্য পাওয়ার আশাই আমার ছিল না। আর কোনো আগন্তুকও যে এসে পড়বে তেমন আশাও খুব কম ছিল।

এই সময় যুক্তি দিয়ে নানা বিষয় চিন্তা ক'রে মনে জোর আনা দরকার, কিন্তু আমার পক্ষে যেন তাও সম্ভব হচ্ছিল না। ঐরূপ অবস্থা থেকে বাঁচার তাগিদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার অন্তর যেন গর্জন ক'রে উঠল—"অনন্ত সিং তোমার মরা চলে না, তুমি মরতে পার না, তোমাকে বাঁচতেই হবে।" হ্যাঁ বাঁচতে আমাকে হবেই—মৃত্যুকে আমার জয় করতেই হবে। জানি না কোথা থেকে দুর্জয়

সাহস ও মনোবল ফিরে এল। আমি আমার সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে নিজেকে একেবারে সম্মোহিত করেছি। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগোতে লাগলাম। এমনি সময়ে আমার চলার পথের পাশে দেখলাম মাটিতে একটি অর্ধ-ভুক্ত কাঁচা আম পড়ে আছে। এইজনশূন্য স্থানে এই অর্ধ-ভুক্ত আমটি কি ভাবে এল— এত সব বিচার ক'রে দেখবার সময় বা ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি ছুটে গিয়ে সেই আধ খাওয়া আমটি তুলে নিয়ে খেতে শুরু ক'রে দিলাম। শুকনো মুখ, গলা ও বুক আমটির রসে কিছুটা ভিজল। আমি একটু সুস্থ বোধ করতে লাগলাম। ঐরূপ অপ্রত্যাশিত আমটি কোথা থেকে এল, সে বিষয়ে চিন্তা না করলেও চলবে। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া যায় কোনো পাখি এটা হয়তো মুখে ক'রে এনেছে।

আমি তখন পাহাড়ের পাদদেশসংলগ্ন বন্ধুর এলাকা ছেড়ে সমতলভূমিতে চলে এসেছি। মনে হল কাছাকাছি কোথাও লোকালয় আছে। আর একটু এগোতেই বাঁশ কাটার শব্দ কানে এল—কারা যেন বাঁশ কাটছে। দু'-একজনের কথাও শোনা যাচ্ছিল। আমি ঠিক করলাম তাদের কাছে যাব এবং যদি একা কাউকে পাই তবে তাকে আমি আমার কথা বলে সাহায্য ভিক্ষা করব। আর আমার প্রথম সাক্ষাতে হাবভাবে পেটে হাত রেখে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করব যে, আমি খুব ক্ষুধার্ত—কিছু খেতে চাই। এই অজুহাতে মানুষের কাছে বা নির্বাচিত কোনো লোকের কাছে অগ্রসর হওয়া যায়। যে ঝোপটিতে বাঁশ কাটার শব্দ হচ্ছিল আমি সেই ঝোপটির কাছে গেলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেলাম খুব কাছেই আমার পাশে দু'-তিন জন বাঁশ কাটছে। তাদের দেখে আমি খিদের ভান করতে চাইলাম। কিন্তু কে আমার অভিনয় দেখবে! তারা তিনজনেই যেন ভূত দেখার মতো চম্‌কে উঠে ঘন ঘন হাত নেড়ে বলতে লাগল— 'যা, যা, যা, তুই এখান থেকে চলে যা!' আমিও প্রস্থান করলাম।

একটু মোড় নিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে গ্রামের সরু মেঠোপথ ধরে এগোলাম। দেখতে পেলাম জনৈক বয়স্ক মুসলমান কৃষক লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করছে। তাকে দেখে আমি সেই মাঠের ধারে বসে পড়লাম। সে একটু দূরে ছিল, তবু সে আমাকে দেখতে পেল। সে আমাকে হঠাৎ দেখতে পেয়েছিল। আমি তার করুণা উদ্রেকের জন্য আমার পেটে হাত রেখে ও নানা অঙ্গভঙ্গি ক'রে তাকে বোঝালাম—আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমি খেতে চাই। সেই কৃষকটি খুব সহানুভূতির সাথে তার দু'হাত দিয়ে ইঙ্গিত ক'রে বলল, আমি যেন একটু বসি, সে আমাকে খেতে দেবে। তারপর সে লাঙ্গল ছেড়ে আমার কাছে এল। খুব কাছেই একটি ঝুড়িতে তার নিজের জন্য জল ও খাবার জিনিস ছিল। আমি ইঙ্গিতে তৃষ্ণার কথা জানালাম। সে আমাকে জল দিল এবং একটি ফুটির অর্ধেকটা খেতে দিল। আমি মহাআনন্দে ও খুব তৃপ্তির সঙ্গে খাই, তবে দু'হাতে সেটি নিয়ে পাগলের মতো ভান করে খেতে লাগলাম—ফুটির বিচিও ফেললাম না, ওপরের খোসাও ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সবই খেয়ে ফেললাম। তাঁকে আমার খুব দয়ালু ব'লেই মনে হয়েছিল। তাঁর ওপর বিশ্বাস ক'রে সব বলব ব'লে স্থিরও ক'রে ফেললাম। কিন্তু আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলতে পারছি না, আমার কথা বলতে যাব এমন সময় দেখি তিন-চারজন লোক কোথা থেকে যেন বাজার ক'রে সেই পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছে। মনে হল তারা যেন চাষীভাইটির পরিচিত লোক এবং পরস্পর তারা সেইভাবে কথা বলল। আমি কে এবং কোথা থেকে এসেছি, এই সম্বন্ধে বৃদ্ধ চাষীভাইটিকে কি যেন তারা জিজ্ঞাসা করল। সেও যেন কি একটা উত্তর দিল। তারা সেখানে দাঁড়ায় নি, পথ চলতে চলতেই তাদের পরস্পারের মধ্যে কথা হল। ভাবলাম নিকটে কোথাও বাজার-হাট আছে এবং সেখান থেকেই তারা তখন ফিরছিল। তাদের মতো আরও অনেকের সেখান দিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে মনে করেই বৃদ্ধ চাষীভাইটিকে খুব ভালো-লাগা

সত্ত্বেও তাঁকে আর কিছু বলতে সাহস করলাম না—পাগলের খেয়াল—হঠাৎ হাঁটতে শুরু করলাম।

পিপাসা ও ক্ষুধার কিছুটা নিবৃত্তি হল। শরীরে একটু জোর পেলাম। কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে এলাম, তা বলা মুশকিল। এখন হেঁটে চলেছি চাষ-আবাদের জমির ওপর দিয়ে। অনতি দূরে দেখতে পেলাম নতুন রেলের লাইন। বুঝে নিতে অসুবিধা হল না যে এইটি ফেণী-বিলোনিয়ার নতুন লাইন। আমি সেই লাইনের দিকে এগোলাম। ভাবলাম রেল-লাইনের পাশে নিশ্চয়ই ট্রাঙ্ক রোডের মতো কোনো বড়ো রাস্তা পেয়ে যাব আর সেই রাস্তা ধরেই অগ্রসর হব বিলোনিয়া হয়ে কুমিল্লার দিকে। আমি যে দিকে ছিলাম সেদিকে রেল-লাইনের পাশে রাস্তাটি ছিল না। তাই ধরে নিলাম রেল-লাইনের অপর পার্শ্বে প্রায় পাশাপাশি ট্রাঙ্ক রোড থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। আমি রেল-লাইনটির অপর পার্শ্বে যাব, এমন সময় দেখি নিকটের একটি মাঠে যে বালকের দল খেলা করছিল, তারা আমার এই কৌপীনধারী পাগলের বেশ দেখে খুব উৎসুক হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পাগলের প্রতি বিরূপ হল। তারা তাদের ছোট ছোট হাতে মাটির ঢিল ছুড়তে লাগল আর হৈ হৈ ক'রে তাড়া করতে করতে আমার পিছু নিল। এইরূপ মর্মান্তিক অবস্থার জন্য আমি একটুও প্রস্তুত ছিলাম না। এ এক ভীষণ বিপর্যয়। কি করি? কি ভাবে তাদের হাত থেকে মুক্তি পাব? কাছাকাছি কোনো বয়স্ক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল না। তাদের উপস্থিতি সুবিধা-জনক বা আরও অসুবিধা সৃষ্টি করবে, তাও বুঝতে পারছিলাম না। একবার মনে হল আমিও তাদের আক্রমণাত্মক ভাবভঙ্গি দেখিয়ে তাড়া করি, পরমুহূর্তেই বুঝলাম সেটি আমার খুবই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় হবে। ঠিক করলাম একেবারে নির্লিপ্ত হয়ে পথ চলব, ভাবে দেখাব আমি যেন কিছুই বুঝতে পারছি না—কে আমাকে মারছে বা তাড়া করছে। ঐ সব থেকে আমি যেন একেবারে উর্ধ্বে—সম্পূর্ণ উদাসীন।

বালকের দল যখন দেখল আমার ভেতরে কোনো তাপ-উত্তাপ বা কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া নেই, তখন আস্তে আস্তে তাদের হাত যেন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল এবং ঢিলের সংখ্যাও কমে আসছিল। কিন্তু তারা পিছু নেওয়া ছাড়ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্রমে ক্রমে তাদের আমার পিছু নেওয়ার উৎসাহও কমে গেল। আমি এই সময় নিজের অজান্তেই একটি পাড়ার অভ্যন্তরে এসে পড়েছি। কোন্ দিক দিয়ে গেলে একটি বড়ো রাস্তা পাব, তার হদিস করতে পারছিলাম না। হঠাৎ দেখি আমি একটি মুসলমান বাড়ির চত্বরের মধ্যে এসে হাজির হয়েছি। মনে হল এই বাড়ির চত্বরটি পেরিয়ে গেলে হয়ত কোনো একটি রাস্তা পেয়ে যাব। কিন্তু সেই মুসলমান বাড়ির মধ্যে কেবল জনকয়েক মহিলাকে দেখলাম। তাদের দেখে আমার ভয় হল এই ভেবে যে, এই নির্জন দুপুরে যখন কোনো পুরুষমানুষের বাড়িতে না থাকার সম্ভাবনাই বেশী, তখন আমার এই বেশে সেখানে আবির্ভাব তাঁরা হয়ত পছন্দ করবেন না এবং হয়ত চিৎকার চেঁচামেচিও শুরু করতে পারেন। আর সেইরূপ অবস্থায় বাড়ির পুরুষরাও হয়ত এসে পড়বেন, এবং তারা আমাকে মারধোরও করতে পারেন। কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটল না। তাঁদের সবাইকে শান্ত ও সংযত মনে হল। তারপর দেখি বাড়ির দু'একজন পুরুষ মানুষও এসে উপস্থিত হলেন। আমি অসহায় ভাব দেখিয়ে পথ খুঁজছি এরূপ হাবভাব করায় তাঁরা আমাকে পথটি দেখিয়ে দিলেন। আমি তাঁদের নির্দেশিত পথ ধরে কিছু দূর যাবার পর রেল-লাইনের ডান দিকে—অর্থাৎ আমি যে দিকে মুখ ক'রে হাঁটছিলাম তার ডান দিকে রেল-লাইনের সমান্তরালে একটি বড়ো রাস্তা পেলাম।

"জানি আমি তোমার হৃদয়ে
অজস্র ঔদার্য আছে ; জানি আছে সুস্থ শালীনতা
জানি তুমি আঘাতে আঘাতে
এখনও স্তিমিত নও, জানি তুমি এখনও উদ্দাম—
হে চট্টগ্রাম।"

॥ ৭ ॥

ঊষার সঙ্গে গতকাল কথা বলতে গিয়ে যে সব চিত্র আমার মনে ভেসে উঠেছিল, তার বর্ণনা আমি আগেই দিয়েছি। সেই কথাগুলোই আজ আমি আমার সহবন্দীদের শোনালাম, তার পুনরাবৃত্তি এখানে করা নিষ্প্রয়োজন।

ঐ সব দুরন্ত বালকদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পর আমি শ্রীমতী ঊষারাণীদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। তারপরের ঘটনাবলীর বিবরণ আমি আগেই দিয়েছি। এর পরের ঘটনার আলোচনা আজ আর করব না। আমার সহবন্দী বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করলাম—তোমরা এখন আমাকে বলো—এই নাটকীয় ঘটনা সম্বন্ধে তোমাদের কার কি মনে হচ্ছে ? এতক্ষণ সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। এখন আমার এইরূপ তাদের কাছে শুনতে চাওয়ার প্রস্তাবে তারা মুখ খুলবার সুযোগ পেয়ে খুব খুশী হল। সবাই তারা প্রায় একটা কথাই বলল যে, আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হয় তা দেখবার জন্য তারা অত্যন্ত আগ্রাহান্বিত ও উৎসুক হয়ে ছিল। দেবব্রত ভট্টাচার্য বলল, যেদিন আমার ঘরে আমি শ্রীমতী ঊষারাণীর পোস্টকার্ডটি তাদের পড়ে শোনাচ্ছিলাম সেদিন সে আমাকে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করছিল। সে আরও বলল যে, পোস্টকার্ডটি পড়ার সময় আমার কণ্ঠ মাঝে মাঝে রুদ্ধ হয়ে আসছিল। আমি যেন একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, ইত্যাদি। তার ঐরূপ বর্ণনাকে এক এক ক'রে

অন্যরাও নিজ নিজ ভাষায় সমর্থন জানাল। তাদের কথা শুনে আমি কিছুটা অপ্রতিভ হলাম—মনে মনে কিছুটা লজ্জাও অনুভব করছিলাম। তারা আমার ঐরূপ বিব্রতভাব লক্ষ্য করে তখনকার আবহাওয়া সহজ করার চেষ্টা করল। তাদের মধ্যে অনেকেই বলল এবং অন্যরাও মৌন থেকে সেই একই কথার সমর্থন জানাল যে, এইরূপ একটি বাস্তব ঘটনা উপন্যাসের যে কোনো অত্যাশ্চর্য ও আকস্মিক দৃশ্যকেও মলিন ক'রে দেয়। এইরূপ একটি স্মৃতির উদ্ঘাটন আপনার জীবনে একটি বাস্তব সত্য। আমরা কি ক'রে তার পরিধি বা গভীরতার খোঁজ পাব? যাদের এইরূপ নাটকীয় অথচ বাস্তব ঘটনার মূল্যকে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা নেই, তাদের এই ধরনের একটি অবিশ্বাস্য ঘটনার প্রতি ঔদাসীন্য বা কটাক্ষ করার প্রবৃত্তিকে পরশ্রীকাতরতা ছাড়া আর কি বলা যায়? তারা বেশ গুরুত্ব সহকারে বলল: আমরা নিজেদের মনের গভীরতাকে গোপন রেখে অনেক কথাই হাসি ঠাট্টা ক'রে বলেছি। তারা আমাকে আরও বলতে চাইল এবং নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করল যে, যদিও তাদের কারো জীবনে এইরূপ একটি ঘটনারও নজির নেই, তবু আমার অন্তরের প্রতিক্রিয়াগুলো অন্তত উপলব্ধি ক'রে যদি আমার জীবনচিত্রের একটি স্বরূপ তারা বুঝতে পারে, তবে ভবিষ্যতে তাদের নিজেদের ও অপরের ভাবপ্রবণ হৃদয়ের মনস্তত্ত্ব বুঝবার বাস্তব জ্ঞান কিছুটা হয়ত অর্জিত হবে।

তারা সবাই এমনভাবে এসব কথা বলছিল যে, তাতে আমি যতই বিব্রত বোধ করি না কেন, তবু অনুভব করছিলাম আমার প্রতি তাদের গভীর আন্তরিকতা।

গৌরাঙ্গ মজুমদার একদিন পরে আমার এখানে এসেছে। সে একা ছিল, কাজেই সুযোগ পেয়ে সেই পূর্ব প্রসঙ্গ নিয়ে বলতে লাগল "এরকম ঘটনার নজির আর একটাও কি আমার জানা আছে! এধরনের কাহিনী কখনও কি আর কারো কাছে শুনেছি! কোনো

উপন্যাসেও কি এরকম একটা অস্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ দেখেছি! আমি অনেক ভেবেছি আর অনুভব করতে চেষ্টা করেছি—আপনি কতখানি অভিভূত হয়েছেন, কতখানি ভাবপ্রবণতায় আপনি অতীত স্মৃতির স্বপ্নজগতে বিভোর ছিলেন! ভাবছিলাম, যদি আমার জীবনে এরকম একটা ঘটনা ঘটতো—কি করতাম আমি? মনে প্রশ্ন এসেছে, সবার ভাবপ্রবণতার বিকাশ ও গভীরতা কি এক হতে পারে? মানুষের জীবনে ভাবপ্রবণতার স্থান থাকা উচিত কি? আর ভাবপ্রবণ মন উচিত অনুচিতের অপেক্ষা রাখে কি? আবার ভেবেছি—ভাবপ্রবণতা মানুষের জীবনে থাকবে না, তাতো হতে পারে না! যদি আমাদের অনুভূতি, ভাবপ্রবণতা, হৃদয়াবেগ প্রভৃতি না থাকে, তবে কেবলমাত্র যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণগ্রাহ্য আদর্শকে আমাদের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কি অবিচলিতভাবে ধরে রাখা সম্ভব? আদর্শের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আর তার নির্ভুলতাই কি সেই আদর্শকে নিষ্ঠার সঙ্গে আজীবন পালন ক'রে যাওয়ার একমাত্র সর্ত? আমার মনে হয় দ্বন্দ্বমূলক যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে প্রতিপাদ্য বিষয় সঠিকভাবে বোঝা নিশ্চয়ই যায় এবং এটাও খুব সত্য যে, তাতে আমাদের প্রত্যয়ও জন্মে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সেরূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও আদর্শকে তারাই আজীবন আস্থার সঙ্গে ততবেশী ধরে রাখতে সমর্থ হয়, যাদের মন যতবেশী আবেগ ও অনুভূতিপ্রবণ।"

এসব বলার পর সে এই সম্বন্ধে আমার অভিমত জানতে চাইল। আমি মোটামুটি তার এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে সমর্থন জানাই। সেইসঙ্গে আমি সুর মিলিয়ে আর একটু বলি যে, মানুষের Sentiment (ভাবপ্রবণতা) আছে—থাকবেও। এই Sentiment পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। যুক্তি-তর্ক ও বিচার বুদ্ধির অপেক্ষা না ক'রেই আমাদের অনুভূতি ও ভাবপ্রবণ মন আমাদের আলাদা আলাদা পথ, তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে প্রভাবান্বিত করে।

কেউ কেউ আবার দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ছাত্র হয়ে গবেষণা ক'রে জীবনের আদর্শটি বেছে নেয়। আর আমরা যদি ভাবি, তারা Sentiment বিমুক্ত হয়েছে, তবে তা হবে আমাদের অবাস্তব চিন্তা—সত্যকে অস্বীকার করা। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা এবং তা গ্রহণ করা সম্ভব যদি তা গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম ক'রে সঠিক পথে সত্যনিষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়। বৈজ্ঞানিক মহৎ আদর্শ তারপরই ধ্রুব-তারার মতো আমাদের জীবনাকাশে শেষ পর্যন্ত প্রতিবিম্বিত হতে পারে।

তাকে আরও একটু পরিষ্কার ক'রে বললাম, আমরা স্ব স্ব মতে কি ক'রে স্থির থাকতে পারি? প্রত্যেকেই কিন্তু বলবেন তিনি সমাজ-বিজ্ঞানের তত্ত্বকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাহায্যে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে অভ্রান্ত সত্য বলে মনে করে তার আদর্শের সঠিকতা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হতে পেরেছেন।

এইরূপ আপন সিদ্ধান্তকে নির্ভুল মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং সেই কারণে অপরের সিদ্ধান্তকে নিখুঁত সত্য বলে স্বীকার করার মানসিকতা আমরা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হই। এখানে তুলনামূলক-ভাবে বললে অবান্তর হবে না যে, সোভিয়েত রুশদেশের বর্তমান নেতারা মার্ক্সীয় দর্শনের সঠিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিজেদের নীতি ও কৌশলকে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও ধ্রুবসত্য বলে মনে করেন এবং তাঁদের মতে চীনে বর্তমান নেতৃবৃন্দ অমার্ক্সীয় ভাবপ্রবণতা মুক্ত নয় বলেই ভুল ক'রে বিপথে চালিত হচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের এইরূপ বক্তব্যে চীনা-নেতাদের কি আসে যায়? সোভিয়েত তাত্ত্বিক নেতারা এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে হয়ত আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন—তবে তাঁদের এই আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশের কমিউনিস্টরা একমত হবেন কি? চীনদেশের রাষ্ট্রনায়ক ও তাত্ত্বিক নেতারা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক তত্ত্বসমূহ কি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী পদ্ধতিতে অধ্যয়ন, উপলব্ধি ও তার বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়ে সফল বিপ্লবের নেতৃত্বদান করেন নি? অপরপক্ষে, চীনদেশের তাত্ত্বিক

নেতারা রুশদেশের তথাকথিত কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে যদি শোধনবাদী নীতির প্রভাব লক্ষ্য ক'রে থাকেন, তবে তা কি চীনের তাত্ত্বিক নেতাদের ভুল হবে? এর সঠিক জবাব কে দেবে? এইরূপ ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের কমিউনিস্টরা কার বক্তব্যকে সঠিক ব'লে গ্রহণ করবেন? হয় তাদের উভয় মত ও বক্তব্যকে ভুল ব'লে পরিত্যাগ করতে হয়, নয়ত যে কোনো একটি সঠিক অপরটি ভুল ব'লে সিদ্ধান্ত করতে হয়। আবার ধরা যাক, এইরূপ ক্ষেত্রে যদি কমিউনিস্ট ব্যক্তি বিশেষ বা কোনো গোষ্ঠী এই উভয় বক্তব্যের মধ্যে একটিকে সঠিক ও অপরটিকে ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তকর ব'লে ঘোষণা করেন, তখন তাদের এই ব্যাখ্যা শুনে, আমরা রুশ না চীন—কার বক্তব্যকে সঠিক বলে গ্রহণ করব?

অনেকে হয়ত বলবেন—'কেন, উভয়ের মধ্যে যেটি সঠিক, সত্য ও অভ্রান্ত সেটাকেই গ্রহণ করতে চেষ্টা করব?' আমার প্রশ্ন: 'কি ক'রে আপনারা কোন্‌টি ধ্রুবসত্য ও অভ্রান্ত তা বুঝবেন? এর জবাবে তাঁরা হয়ত বলতে পারেন: 'সত্য যা, তা সব সময়েই সত্য। সত্য একটি মাত্র হয়—দু'টি নয়! যা অভ্রান্ত, তা অভ্রান্তই। দু'টো মত একসঙ্গে সত্য হতে পারে না। সুতরাং, হয় চীন, না হয় রুশ নেতৃবৃন্দের মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির কোনো একটি সঠিক, আর অন্যটি ভ্রান্তিকর।' আমার মতে, যারা আত্মগত চিন্তার বশবর্তী হয়ে নিজের অজান্তে আগে থেকেই নিজের ভাবপ্রবণতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে একটি মতকে সঠিক ব'লে সাব্যস্ত ক'রে ফেলেন—তাঁরা তখন একমাত্র নিজের গৃহীত মতাদর্শ ও রাজনৈতিক মতবাদকে অভ্রান্ত সত্য ব'লে মনে করেন ও তাদের মতকে সঠিক দ্বন্দ্বমূলক চিন্তা ও বিচার বিশ্লেষণের ফল বলে দাবী করেন। আমার বক্তব্য হল: ভালো কি মন্দ, সঠিক কি বেঠিক, সত্য কি মিথ্যা, ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত—তা আমরা আমাদের অনুভূতি ও ভাবপ্রবণ মন দিয়েই প্রথমে অনুভব ও গ্রহণ করি—আর আমাদের এই অনুভূতি ও ভাবপ্রবণ মনের গঠন অর্থনৈতিক, সামাজিক

ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবেই গড়ে ওঠে। আমাদের মানসিক প্রবণতা বাস্তব পরিবেশের প্রভাবাধীন। আমরা প্রাথমিকভাবে আমাদের মানসিক প্রবণতা দিয়েই নিজ ব্যাখ্যা অনুযায়ী মত, পথ ও আদর্শকে গ্রহণ করি এবং ধাপে ধাপে যুক্তি-তর্ক দিয়ে তা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাই।

তারপর আমি গৌরাঙ্গকে আরও বললাম যে, ভারতের কমিউনিস্ট নেতারাও বস্তুবাদের নিজ নিজ ব্যাখ্যা অনুযায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—কে ঠিক পথে চলছে, সোভিয়েত রুশ, না চীনের বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক নেতারা? মূল বিশ্লেষণে তা হলে আমরা কি পাচ্ছি? যতই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বড়ো বড়ো কথা বলি না কেন, আসলে আমরা ভাবপ্রবণতার দাস—কেউ সঠিক আর কেউ বা বেঠিক পথে চললেও, প্রত্যেকেই নিজস্ব অনুভূতি ও প্রেরণায় ভেসে চলেছি। কে ঠিক বা কে বেঠিক তা বর্তমানে নির্ভর করছে তারই নিজের মানসিক প্রবণতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে সে অবশ্য নিজে দাবী করে তারই দৃষ্টিভঙ্গি একমাত্র বৈজ্ঞানিক এবং ভূমণ্ডলে সে-ই একমাত্র মার্ক্সীয় দর্শনশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ এবং তারই ব্যাখ্যা একমাত্র সঠিক। সঠিক তো বটেই—কিন্তু বলছে কে? সে নিজে, নয়ত কোনো একটি গোষ্ঠী—যার সভ্য সে নিজে। তার মত, তার দৃষ্টিভঙ্গি—সবই তার মানসিক প্রবণতার প্রভাবাধীন।

আমার চরম অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি যে, ভাবপ্রবণ মনকে অস্বীকার করব না বটে এবং করাও যায় না, তবে [illegible]তে ভাবপ্রবণতার দ্বারা আমরা অন্ধভাবে পরিচালিত হয়ে ন[illegible] সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং সব সময় তাকে দমন ও সং[illegible]রার জন্য আমাদের চেষ্টা ক'রে যেতে হবে। আমি আর একটি সত্য আবিষ্কার করেছি যে, যার মন যত বেশী ভাবপ্রবণ, সে তত বেশী তার হৃদয় দিয়ে কোনো আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে এবং আমরণ তাতে একনিষ্ঠ ও অবিচলিত থাকার দৃঢ়তা সাধারণত তারই বেশী থাকে।

কোনো জিনিস হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা এবং হৃদয় দিয়ে তা গ্রহণ করা তাদের পক্ষেই ততবেশী সম্ভব। আর যাদের মধ্যে ভাবপ্রবণতার তীব্রতা নেই তারা অতি জোরের সঙ্গে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ বা বর্জন কোনোটাই করতে পারে না। তারা অতি সাধারণ মানুষ, অতি সাধারণভাবেই দিন কাটিয়ে থাকে—কোনো কিছুতেই তাদের অন্তরে দাগ পড়ে না। এখানে আবার একটু বলি—মানুষের বেশভূষা, তাদের প্রখর সময়জ্ঞান যেমন তাদের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক তুলে ধরে, ঠিক তেমনি তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, মানুষের প্রতি দরদ, আদর্শের জন্য আত্মাহুতি দেওয়ার ক্ষমতা, চরম স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা, নিজের স্বার্থকে আদর্শের স্বার্থের সঙ্গে একীভূত করা, চরম সাহস ইত্যাদির সঠিক মূল্যায়ন করতেও তার সত্যনিষ্ঠা ও মানসিক ক্ষমতা বহুলাংশে সাহায্য করে।

ঝোঁকের মাথায় এইসব কথা ব'লে ফেললাম। তারপর আবার ফিরে এলাম আমার আজকের বিষয়ে, সেই অতীতের স্বপ্নজগতে। আমি সহবন্দী বন্ধুদের কাছে শ্রীমতী ঊষার এই নাটকীয় ঘটনা নিয়ে এবং আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে কত কথাই না বলেছি, আর সেই সঙ্গে আমি কি একবারের জন্যও ভুলতে পারছিলাম—বিলোনিয়ার সেই কৃষকভাই সুরেনের কথা, ভুলতে কি পেরেছি সেই মুসলমান রাখালের প্রত্যুৎপন্নমতি ও পুলিশের বেষ্টনীর মধ্যে তার সাহস ও সহৃদয়তার অভূতপূর্ব অবদানের কথা ?

তখন প্রায় বিকেল চারটে বেজে গেছে। নাগারখানা টিলাটা চট্টগ্রাম জেলার সশস্ত্র কনেস্টবল গিয়ে ইতিমধ্যে ঘিরে ফেলেছে। এই টিলার পাদদেশেই প্রায় দুপুর দু'টোর সময় বন্দুক হাতে একজন চৌকিদার আমাদের ছ'জনকে দেখে সন্দেহ ক'রে হাঁক দেয়। আমরা ছ'জন হলাম—মাস্টারদা, অম্বিকাদা, রাজেন দাস, দেবেন দে, অবনী ভট্টাচার্য ও আমি। থানায় থানায় এই খবর পৌঁছে যায় যে, 'সুলুকবাহার' নামে পুরনো বাড়ি থেকে পুলিশদের বিভ্রান্ত ও তাদের

আক্রমণ প্রতিহত ক'রে সেই ছ'জন লোক পালিয়েছে। কাজেই আমরা যখন একটি টিলা পরিত্যাগ ক'রে সামনের রাস্তাটি অতিক্রম করার পর নাগারখানা পাহাড়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, তখনই চৌকিদার আমাদের দেখতে পেয়ে হাঁক দেয় এবং আমরা কারা, কোথা থেকে আসছি ইত্যাদি প্রশ্ন করতে লাগল। আমাদের ছিন্নভিন্ন পোশাক, প্রত্যেকের কাঁধে একটা ক'রে ব্যাগ ঝুলছে—ব্যাগের মধ্যে আছে রিভলভার। চৌকিদার নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারে নি, আমরাই সেই ছ'জন সশস্ত্র লোক তাই চৌকিদারের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কথা বলতে বলতে তার চার-পাঁচ হাতের মধ্যে চলে গেলাম। আমার ইচ্ছে ছিল তার বন্দুকটি আচম্বিতে কেড়ে নেব। আমি যখন এই মতলবে চৌকিদারটির সাথে কথা বলছিলাম, তখন বাকি সবাই অর্ধেক পাহাড়ের ওপর উঠেছে। দেবেন দে তখনও তাদের সঙ্গে যায় নি, সে আমার পাঁচ-ছ'গজ পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। সুযোগ বুঝে মুহূর্তে চৌকিদারের বন্দুকটি আমি ধরে ফেলি। তার বন্দুক যে রকম জমির সমান্তরাল অবস্থায় ধরা ছিল সেই অবস্থাতেই সে গুলি চালাল। কিন্তু গুলিটি আমার গায়ে না লেগে অন্য দিকে চলে গেল। আমিও রিভলভার দিয়ে গুলি করলাম। ভয়ে চৌকিদার বন্দুক ফেলে ছুট দিল। তারপর পালাবার সময় তাকে আহত বা মেরে ফেলার জন্য আমি আর একটি গুলি চালালাম না। তবে আছাড় মেরে বন্দুকটি ভেঙে ফেললাম। ইতিমধ্যে একটি অঘটন ঘটে গেল। আমি যখন পাহাড়ের প্রায় মাঝামাঝি উঠেছি, নিচ থেকে দেবেন চেঁচিয়ে আমাকে ডাকতে লাগল এবং বলল যে, তার গায়ে গুলি লেগেছে, সে আর হাঁটতে পারছে না।

সে এক ভীষণ অবস্থা! আমি আমার ক্লান্ত দেহ নিয়ে আবার নিচে নেমে এলাম। দেবেনকে কাঁধে নিয়ে অতি ধীরে ধীরে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম। আমরা সবাই খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। নিচে এইমাত্র চৌকিদারটির সাথে যে ঘটনাটি ঘটল—তা সত্ত্বেও যেহেতু

আমাদের আর চলার শক্তি ছিল না, তাই সেই পাহাড়েরই ওপরে উঠে একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে সজাগ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। নিচে চৌকিদারটির সাথে গুলিবিনিময় ও তার বন্দুকটি কেড়ে নেবার খবর ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই রাষ্ট্র হয়ে গেছে। পুলিশ লাইনের সব বন্দুকধারী সিপাই সকাল সাড়ে দশটায় বেরিয়ে পড়েছে। আমরা যখন 'স্থলুকবাহার' বাড়িটি থেকে বেরিয়ে একটি মাঠ অতিক্রম করছিলাম, তখন পুলিশ লাইনে তাদের প্রস্তুতির জন্য যে ঘণ্টা বাজছিল, তা আমরা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলাম। কাজেই অনুমান ক'রে নেওয়াটা খুব অযৌক্তিক হয় নি যে, পাহাড়ের ওপর ঐ স্থানে বসে থাকাটা নিরাপদের নয়। পুলিশ নিশ্চয়ই এসে পড়বে এবং আক্রমণ করবে। সব বুঝেসুঝেও দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের কারো আর নড়বার ক্ষমতাটুকু নেই। স্বভাবত সেখানেই আমাদের বসে থাকতে হল। নিচে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশের বাঁশির শব্দ শুনতে পেলাম, কথাবার্তাও কিছু কিছু কানে আসছিল। আমরা বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, ইতিমধ্যে পাহাড়টিকে তারা ঘিরে ফেলেছে।

পুলিশের আগমন ঘটেছে। নিচে চারিদিকে তাদের তৎপরতা চলেছে। পাহাড়টি যে ঘিরে ফেলেছে তাতে কোনো সন্দেহই রইল না। আর দেরি না করে তারা যে এবার নিশ্চয়ই আক্রমণ করবে তার জন্য তৈরী হয়ে সময় গুণছিলাম। লতাপাতার ঝোপের আড়ালে বসেছি। কিন্তু এইরূপ আড়াল বন্দুক বা রাইফেলের গুলির কাছে দুর্ভেদ্য নয়। চারিদিকে দেখছিলাম আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য উপযুক্ত কোনো আড়ালের সুযোগ নেওয়া যায় কিনা ? যদি বড়ো গাছের পেছনে আড়াল নিয়ে বসার সুযোগ পেতাম, তবু হয়ত পুলিশের গুলির বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব ছিল। শুনতে পাচ্ছিলাম এবং বুঝতেও পাচ্ছিলাম তারা কয়েকজন পাহাড়ের ওপর উঠছে। প্রথম সারির মধ্যে যারা ছিল তাদের মধ্যে দু'জনের মুখে বলতে শোনা

যাচ্ছিল—"জানের কি পরোয়া! জানের কি পরোয়া!" এই বলতে বলতে তারা পাহাড়ের একেবারে ওপরে উঠে এসেছে। আমরা ওখান থেকে তাদের দূরত্ব তখন খুব বেশী হলেও দশ গজের বেশী নয়। আমরা রিভলভার পিস্তল হাতে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে ছিলাম। তাদের 'জানের কি পরোয়া' শেষ বারের মতো উচ্চারণ করার আগে এবং বন্দুক আমাদের দিকে তাক করার পূর্বেই গুড়ুম গুড়ুম শব্দে গর্জে উঠল আমার রিভলভার। সবার অগ্রণী সেই তু'জন সিপাই আহত হয়ে বন্দুক নিয়েই গড়িয়ে পড়ল। আর তাদের পেছনের সবাই ছত্র-ভঙ্গ হয়ে দিল ছুট। তারা তো পালাল, কিন্তু আমাদের মধ্যে দেখা দিল এক শোচনীয় প্রতিক্রিয়া। আসন্ন বিপদ মনে ক'রে এবং 'প্রাণ থাক্‌তে কখনই ধরা দেব না'—এইরূপ স্থির ক'রে মাস্টারদা অম্বিকাদা ও রাজেন দাস 'পটাশিয়াম সায়ানেড'—তীব্র বিষ খেয়ে নিলেন।

বিদায়ের শেষ পালা অতি মর্মান্তিক! তবু মাস্টারদাকে শেষ বারের মতো অন্তরের বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে আমরা প্রস্তুত হলাম পুলিশের বেষ্টনী ভেদ ক'রে এই পাহাড় থেকে বেরিয়ে সামনের সারি দেওয়া পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয় নেবার জন্য। কিন্তু এই ইচ্ছা কাজে পরিণত করতে হলে আগে এই পাহাড় থেকে নামতে হবে এবং তুই পাহাড়ের মাঝের পথটি অতিক্রম ক'রেই সারি বাঁধা পাহাড়ে যাওয়া যাবে। নাগারখানা পাহাড়ের পশ্চিম দিকে গিয়ে চেষ্টা করলাম কোনো মতে নেমে যাওয়া যায় কিনা। দেখলাম পুলিশ পথ অবরোধ ক'রে আছে। আমরা তুই বিরুদ্ধ পক্ষই বড়ো বড়ো গাছের আড়াল থেকে বেশ কিছুক্ষণ গুলি বিনিময় করলাম। তারপর সেখানে আর বেশী শক্তিক্ষয় না ক'রে দক্ষিণ দিকের পথে পাহাড় থেকে নামতে চেষ্টা ক'রে দেখি সেখানেও পুলিশ গাছের আড়ালে ঘাঁটি ক'রে বসে আছে। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েই তারা গুলি চালাতে শুরু করল। আবার কিছুক্ষণ তু'পক্ষে যুদ্ধ হল। কিন্তু নিষ্ফল সেই চেষ্টা।

কাজেই চেষ্টা ক'রে দেখবার জন্য আমরা উত্তর দিকে এলাম। আমাদের চলাফেরার জন্য গাছপালা নড়ছিল আর তাই দেখে পুলিশরাও আমাদের গতিবিধির সন্ধান অনুমান ক'রে নিতে পারছিল। তারা উত্তর দিকের পথের উল্টো দিকে যে পাহাড়ের সারি ছিল, সেই সারিরই কোনো এক গোপন স্থান থেকে আমাদের অস্তিত্ব অনুমান ক'রে গুলি ছুঁড়ল। এইরূপ হঠাৎ গুলি এসে পড়ায় আমরা কিছুটা বিচলিত হলাম এবং যে যেখানে পারলাম চট্ ক'রে আড়াল নিতে চেষ্টা করি। আড়ালের সুযোগ নিয়ে আমরা পাল্টা জবাবও দিলাম। পুলিশ দল এই পাহাড়ের নিচ থেকেও সুবিধাজনক পজিশন নিয়ে গুলি চালাচ্ছিল। পুলিশ চারিদিক থেকে ঘিরে খুব সুন্দর পজিশন নিয়েছিল বলেই আমাদের লক্ষ্য ক'রে চতুর্দিক থেকে গুলি চালাতে পারছিল। এই অবস্থায় পূর্ব, পশ্চিম দু'দিকে প্রতিহত হয়ে উত্তর দিকে এসেও দেখলাম সেখানকার পুলিশ বেষ্টনী উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু আমাদের যে-কোনো উপায়েই সামনের সারিবদ্ধ পাহাড়ের মধ্যে ঢুকতেই হবে। কিন্তু ওপরে ও নিচে দু' জায়গায়ই তাদের ঘাঁটি। দুই পাহাড়ের মধ্যের গ্রাম্য রাস্তাটি আমাদের অতিক্রম করতেই হবে। প্রশ্ন হল, কি উপায়ে? সম্মুখ সমরে তা সম্ভব নয়। ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে সুযোগ সুবিধা নিয়ে বিনা শব্দে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। সেটা কতখানি সম্ভব হবে, তা আগে থাকতে বলা মুশকিল। ধরেই নিয়েছিলাম বেরোন বোধ হয় কোনো মতেই সম্ভব হবে না। তবুও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম শেষ পর্যন্ত প্রচেষ্টা ক'রে দেখার জন্য।

পাহাড়ের ওপর থেকে গুলি আসছিল। আমরা ফিসফিস ক'রে নিজেদের ভেতর ঠিক ক'রে নিলাম, শত্রুর গুলির প্রত্যুত্তর আর দেব না। আমাদের ভান করতে হবে যে, আমরা যেন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছি বা আহত হয়েছি—করলামও তাই। সময় বুঝে আমাদের তিনটি রিভলভারই চুপ ক'রে গেল। এখন

আমাদের কর্তব্য হল, যে-কোনো উপায়ে একেবারে নিস্তব্ধতা অবলম্বন ক'রে গুড়ি মেরে পাহাড় থেকে নেমে যাওয়া, যাতে গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড় একটুও না নড়ে। একটু একটু ক'রে গুড়ি মেরে আমরা নিঃশব্দে পাহাড় থেকে নেমে এলাম। ততক্ষণ পুলিশদল আর একটিও গুলি ছোড়ে নি। আমরা যে নিচে নেমে আসছি, তাও তারা বিন্দুমাত্র অনুমান করতে পারে নি। একেবারে পাহাড়ের পাদদেশে এসে আমরা তিনজন একটি খুব বড়ো গাছের আড়ালে চুপ ক'রে বসলাম। এই বড়ো গাছটির সামনে দিয়েই পাহাড় ঘেঁষেই পূর্ব-পশ্চিমে চলে গেছে একটি পায়ে চলার পথ। আমাদের এখন সমস্যা হল, এই রাস্তাটি অতিক্রম ক'রে যে দিকের পাহাড়ের ওপর থেকে গুলি আসছিল, সেই দিকের আশেপাশের কোনো একটি পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া। কিন্তু বিপদ হল এই যে, জানি না সামনের পাহাড়ে কোন্ কোন্ স্থানে পুলিশ ঘাঁটি ক'রে রয়েছে। আর এই রাস্তাটির ওপরেও পুলিশের ঘাঁটি থাকা অসম্ভব নয়। তাদের দৃষ্টির অগোচরে কিভাবে নিঃশব্দে এই বট গাছটির আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা যায়। সেখানে গাছপালা, ঝোপ-ঝাড় ও বড়ো বড়ো শণ গাছ ছিল। কিন্তু শব্দ হবে না এবং সেগুলো নড়ে আমাদের অস্তিত্বের সন্ধান দেবে না—সেরূপ কল্পনা করা যাচ্ছিল না। আমরা খুব চাপা গলায় ফিসফিস ক'রে কথা বলছিলাম এবং আকারে ইঙ্গিতে নিজেরা সব বুঝে নিচ্ছিলাম। আমাদের প্রত্যেকের হাতে ঘড়ি ছিল। ঘড়ি দেখিয়ে ইঙ্গিতে ও ফিসফিস ক'রে বললাম, রাত দশটা পর্যন্ত এখানেই বসে থাকব এবং পরে রাতের অন্ধকারে আর ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে থেকে আমাদের পথ ক'রে নিতে হবে।

আমরা নিচে নেমে এসেছি প্রায় পনেরো-বিশ মিনিট হবে। আমাদের সামনের রাস্তাটির ওপর দিয়ে একটি রাখাল মুখ দিয়ে "ঘি, ঘি" শব্দ করতে করতে আসছিল। চট্টগ্রামের কৃষকরা গরু খোঁজার সময় মুখ দিয়ে ঐ রকম শব্দ ক'রে থাকে। এই রাখালটি

সেখানে যে গরু খুঁজতে আসে নি, সে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলাম। ধরেই নিয়েছিলাম পুলিশ তাকে গরু খোঁজার ভান করতে করতে আমাদের অস্তিত্ব আবিষ্কারের জন্য পাঠিয়েছিল। ঠিক তাই। সে সেইরূপ শব্দ করতে করতে বট গাছটির পূর্বপ্রান্ত দিয়ে এসে সাত-আট পা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। আমরা তিনজন তার ডান পাশে চার-পাঁচ হাতের মধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে বসে আছি। সে বেচারা কিছুক্ষণ আমাদের লক্ষ্যই করল না। সে তখন পাহাড়ের ওপর দিকে দেখছিল যেখান থেকে আমরা শেষ গুলিটি চালিয়ে ছিলাম। মুখে তার 'ঘি-ঘি' শব্দ, কিন্তু দৃষ্টি তার সেইদিকে। কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল না যে, তারই পাশে তিন-চার হাতের মধ্যে তিন তিনটি রিভলভার তার দিকে তাক্ ক'রে আছে। মিনিট দুই পরে হঠাৎ আমাদের দিকে তার চোখ পড়ল। আমাদের সেই অবস্থায় দেখে সে একেবারে চম্‌কে উঠল, ভয়ে সে তখন একদম ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমি আমার ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে ও ভাবে-ভঙ্গিতে বোঝালাম চুপ করতে এবং ইশারায় তাকে বসে পড়তে বললাম। তারপর ইঙ্গিত ক'রে বোঝালাম কাছে আসতে। সে আমাদের সব কথাই মেনে নিল। ভয়ে সে থরথর ক'রে কাঁপছে এবং সে শত্রুপক্ষের হলেও যে তাকে গুলি করার অভিপ্রায় আমাদের নেই, তা বুঝে হয়ত সে কৃতজ্ঞতাও বোধ করছিল। সে আমার কাছে আসার পর একেবারে ফিসফিস ক'রে তাকে বললাম—আমরা বিপদে আছি, সে যেন আমাদের সাহায্য করে। সে তার অভিব্যক্তি দিয়ে বোঝাল, সে আমাদের সাহায্য করবে এবং আমাদের দেখে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি তাকে বোধ হয় গোটা চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার মতো দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, সে যদি রাত দশটা নাগাদ এসে আমাদের এখান থেকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়, তবে তাকে আমরা প্রচুর অর্থ দেব। সে খুব রাজী, তা জানাল। কিন্তু সে যে কেবল টাকার জন্য রাজী হয়েছিল, সেইরূপ ভেবে নেওয়া গেল না। এত বিপদের মধ্যে

আমাদের রক্ষা করা তার পক্ষেও কম বিপদের কথা নয়। তাছাড়া এখন আমাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পর সে যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। টাকার লোভে বিশ্বাস-ঘাতকতা বন্ধ হয় না। আর পুলিশকে সাহায্য করলে সেখানে পুরস্কারের আশা অনেক বেশী। তাই সে সাহায্য করবে বলাতেই তাকে ছেড়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা সেটি ছিল মস্ত বড় কথা। সময় খুব কম। সেইটুকু সময়ের মধ্যে দ্রুত গতিতে এইসব ব্যাপার ঘটে যাচ্ছিল—সে ভয় পেল, ডাকার পর কাছে এল, তাকে সাহায্য করার কথা বলা হল ; সে সাহায্য করবে ব'লে স্বীকার করল, তাকে টাকা দেওয়া হল এবং রাত দশটার সময় এসে আমাদের সেখান থেকে উদ্ধার করার জন্য অনুরোধ জানানো হল। এতেই তার স্বীকৃতি। এখন তাকে ছেড়ে দিতেই হবে, নইলে পুলিশ সন্দেহ করবে। আবার ছাড়া পাবার পর যদি সে পুলিশকে আমাদের এই অবস্থানের সন্ধান দেয়, তবে পুলিশ আমাদের আক্রমণ করবেই। তার মুখের ভাবভঙ্গির দ্রুত পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করছিলাম। তাকে দেখে বুঝতে চেষ্টা করছিলাম সে সত্যই আমাদের সাহায্য করবে কিনা ?

আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সে আমার কথায় সম্মতি জানিয়ে এবং আমাকে ভরসা দিয়ে '।ঘ-ঘি' বলতে বলতে চলে গেল। আড়াল থেকে আমার চোখ তার গন্তব্য পথটি অনুসরণ করছিল। দেখতে পেলাম আমাদের ওখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে পশ্চিম দিকে রাস্তার অপর পারে আমাদের গাছটির মতোই আর একটি বড়ো গাছের আড়ালে যেখানে পুলিশরা বসেছিল সেখানে সে গেল। পুলিশদের মধ্যে কাউকে দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু তাদের বিড়ির ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছিলাম। আর সে যে সেখানে গিয়ে কারো সঙ্গে কথা বলছে সেটাও বুঝতে পারলাম। ভাবছিলাম যদি সে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে, তবে তার প্রমাণ কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ে যাব।

পুলিশ ঐ গাছের আড়ালে থেকে সরাসরি গুলি চালাবে অথবা কোনো মতে আমাদের পেছনে এসে জঙ্গলের আড়ালে থেকে গুলি চালাবে। দশ-পনেরো মিনিট এভাবে কেটে গেল। তারপর আবার আমাদের বট গাছটির কাছ দিয়ে রাখালটি "ঘি-ঘি" শব্দ ক'রে যাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে তাকে বলতে শুনলাম "চুপ ক'রে বসে থাকুন, কোনো ভয় নেই।" ভয় তো নেইরে বাবা! কিন্তু তোমার 'ভয় নেই' বলাতেই তো যত সব ভয়ের আশংকা দেখছি! যাই হোক, বসে রইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আবার হঠাৎ আমাদের ওখানে এসে হাজির, এবং এসেই আমাদের নানাভাবে বোঝাতে চাইল যে, তার প্রাণ আমাদের জন্য কাঁদছে, আমাদের মঙ্গল হোক, সে বড়ো গরীব, আল্লার কাছে দোয়া চাইছে আমরা যেন নিরাপদে যেতে পারি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তার এই সব ভালো কথা শুনে তাকে যে দুটো ভালো কথা বলব সে অবস্থা তখন আমার ছিল না। তাকে আসতে দেখেই আমি খুব বিরক্ত হয়েছিলাম—কেন এল সে? তার এইরূপ গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে পুলিশ যে সন্দেহ করবে! আমি তাকে বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বললাম—"তুমি কেন এলে ভাই, এমনি ক'রে যদি আস তবে তো পুলিশ সন্দেহ ক'রে বসবে এবং আমরাও ধরা পড়ে যাব।" সে একটু বিব্রত হল—বিরক্ত হয় নি। আমাদের কথা শুনে সে নীরবে চলে গেল।

তখন প্রায় বিকেল সাড়ে পাঁচটা হবে। আমরা আতংক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে বসে আছি এবং দশটা পর্যন্ত সেই একই ভাবে উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় অতিবাহিত করব ব'লে ঠিক করেছি। কিন্তু সেই রাখাল একেবারেই অবুঝ। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবার এসে উপস্থিত! আমি এবার একেবারে ধৈর্য হারিয়ে বিরক্তির সঙ্গে তাকে বললাম, 'তুমি ভাই আমাদের এইভাবে ভীষণ বিপদের মধ্যে ফেলবে। তুমি আবার কেন এসেছ?' আমার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। সে আমাকে বাধা দিয়ে বলল: "বাবু তোমরা এক্ষুনি

এই শণ গাছের ভেতর দিয়ে ঐ সামনের পাহাড়ের ওপর চলে যাও, এক্ষুনি যাও দেরি ক'রো না, এক্ষুনি পালাও! তোমাদের লোক ঐ দিকে ধরা পড়ে গেছে। 'কালেস্টর-মালেস্টর' সব ঐ দিকে এসে গেছে। এদিকে সেপাইদের আমি সে কথা বলেছি, তারাও সে দিকে ছুটে গেছে। এই উপযুক্ত সময়। তোমরা এই মুহূর্তে পালাও। ঐখানেই অপেক্ষা ক'রো আমি পরে আসব।"

তার কথা না মেনে উপায় ছিল না। সন্দেহ করি নি তবু প্রশ্ন ছিল। তার কথায় ভরসা ক'রে আমরা সবাই চট্ ক'রে উঠে পড়লাম। দ্রুত বেগে গ্রাম্য পথটি অতিক্রম করছি আর দেখলাম গাছের আড়ালে রাখাল ভাইকে লুকিয়ে যেতে। দৌড়বার সময় আমরা আশে-পাশে ও সামনের দিকে লক্ষ্য রাখলাম। না, পুলিশের কোনো গুলি এল না। এমন কি তাদের অস্তিত্বও বোঝা গেল না। আমরা দৌড়ে পাহাড়ের ওপর উঠতে লাগলাম। পাহাড়ের ওপর বন্দুক হাতে কোনো পুলিশ বসে আছে কিনা, তার প্রমাণ হয়ত এক্ষুনি পেয়ে যাব। কিন্তু সেইরূপ আশংকা নিয়েও পাহাড়ের ওপর উঠলাম। আমাদের সমস্ত আশংকা, অনিশ্চয়তা ও সকল সন্দেহের নিরসন হল। আমরা নিরাপদে পুলিশ বেষ্টনীর বাইরে পাহাড়ের ওপর এলাম।

রাখাল বন্ধুটি আমাদের এখানেই অপেক্ষা করতে বলেছে। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু সেখানে বেশীক্ষণ বসা গেল না। আমাদের খুব কাছেই দেখলাম, একটি সাপ একটি ব্যাঙকে ধরেছে। আরও দু'একটি সাপের অস্তিত্বও সেখানে বোঝা গেল। তাই সেই পাহাড়টি থেকে নিচে নেমে সামনের আর একটি পাহাড়ের ওপর গিয়ে বসলাম। আগের স্থানটি পরিত্যাগ ক'রে চলে আসায় আমাদের পক্ষে ভালোই হয়েছিল। মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যে সেখানে কয়েক জন সাহেব ও পুলিশের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সাহেব হিন্দিতে কথা বলছে বুঝতে পারলাম। আমরা পাহাড়ের ওপরে বসেছিলাম আর তাদের কথা হচ্ছিল নিচে। যেখানে বসেছিলাম, সেটি খুব

সুরক্ষিত স্থান। ভেবে স্থির করলাম, যখন গ্রামের সব লোক ঘুমিয়ে পড়বে—সব নিস্তব্ধ হয়ে আসবে, তখন সেই স্থান পরিত্যাগ করব। সেই জন্য রাত দশটা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করাটা আমাদের মধ্যে প্রায় ঠিকই ছিল। এই সময়ের মধ্যে রাখাল ভাইটি নিশ্চয়ই আসবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনতে পেলাম জোরে জোরে নিচ থেকে কে যেন শিস্ দিচ্ছে। আমিও প্রতি-উত্তরে শিস্ দিলাম। তারপর আর শিস্ শোনা গেল না। আবার কিছুক্ষণ পরে ঐ শিস্ শোনা গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে শিস্ দিয়ে আমাদের অবস্থানটি জানালাম। আশংকা ছিল যদি শত্রুপক্ষের কেউ শিস্ দিয়ে থাকে আর আমরা প্রত্যুত্তর দিয়ে যদি ভুল করে থাকি, তবে ভুলের মাশুল আমাদের দিতে হবে। বিপদের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করা চলে না। অবশ্য যতদূর মনে হল, এতে সেইরূপ ভুল হবার সম্ভাবনা খুবই কম। পুলিশ এখানে শিস্ দিয়ে তাদের অস্তিত্ব জানাবে কেন ? মাস্টারদাদের ধরা পড়ার পর পুলিশ নিশ্চয়ই ভাববে যে, আমরাও নাগারখানা পাহাড়েই কোথাও না কোথাও মরে পড়ে আছি। এখন রাত প্রায় আটটা। এই রাতেই এত অন্ধকারে, এই সারি সারি পাহাড়ের ওপর আন্দাজে তারা আমাদের কোথায় খুঁজবে ?

আমাদের দু'পক্ষের শিস্ দেওয়া বন্ধ হয়েছে প্রায় একঘণ্টা হয়ে গেল। রাখাল ভাইটির শেষ শিস্ পাওয়ার পর প্রতি মুহূর্তেই ভাব ছিলাম এই বোধহয় সে উঠে এল। এখনও পর্যন্ত সে এল না দেখে খুব হতাশ হয়ে পড়লাম। ঠিক দশটার সময় আমরা এ স্থানটি পরিত্যাগ ক'রে চলে যাই। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই দরদী রাখালভাইটির জন্য কত না উৎকণ্ঠায় সময় কাটিয়েছি। যে আমাদের এতখানি সাহায্য করেছে, বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে যে পুলিশের দলকে ফাঁকি দিয়ে তাদের বেড়াজাল থেকে আমাদের উদ্ধার করল, সে কি আর আসবে না—? আমরা কত ভেবেছিলাম—সে আসবে, আমরা তার বাড়ি যাব, রাত্রে সেখানে খাওয়া-দাওয়া করব, তার কাছ থেকে কাপড়-

চোপড় বা লুঙ্গি কোর্তা প্রভৃতি নেব, আমরা তাকে আমাদের সাধ্য মতো অর্থ দিয়ে সাহায্য করব, তাকে আমাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা জানাব, তার 'দোয়া' নিয়ে আমরা কলকাতায় যাবার ব্যবস্থা করব—এরকম আরও কত কি ভেবেছি। কেন তবু সে এল না ? কেন তার সঙ্গে দেখা আর হল না ? খুব ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমাদের চলে আসতে হল। আজও যখন ভাবি, তখন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না—কেনই বা সে এল, কেন সে সাহায্য করল, কেন সে আমাদের সেই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করল, যে মানুষটি একটি মুহূর্তে অতখানি ধীর, অত সাহস ও অতখানি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল, সেই দরদী মানুষটি আর কেনই বা ফিরে এল না ?

শ্রীমতী ঊষারাণীর মতো তার পরিচয় দেওয়ার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো নিদর্শনই আমার আজ আর নেই। এইটুকু বলতে পারি নাগারখানা পাহাড়ে কোনো বিশেষ স্থানটিতে, বড়ো বটগাছের আড়ালে, তার সঙ্গে আমাদের আকস্মিক সাক্ষাৎ এবং কোন পাহাড়ের মাথায় বসে আমরা তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তাতো আমি বলতে পারব না। ঘটনাটি অবশ্য আমার বইতে আমি বিস্তারিতভাবে লিখেছি। আমরা তিনজন আর সে, সেই বট গাছটির আড়ালের নাটকীয় ঘটনাটি জানি। এই ঘটনাটি তার মনে না থেকেই পারে না। হঠাৎ তিন তিনটি রিভলভার তার দিকে তাক্ ক'রে আছে এবং সে চুপি চুপি কাছে এসে আমাদের নির্দেশ শুনল—এরূপ জীবন-নাট্যটি সে যে কখনও ভুলতে পারবে, তা চিন্তা করা যায় না। ঘটনাটি ঘটেছে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের একেবারে শেষের দিকে। তার অনেক পরে, ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি বই লিখেছি ও তা প্রকাশ করেছি। বইটি প্রকাশিত হয়েছে কলকাতায়। পূর্ব পাকিস্তানে আমার এই বই যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম; তাছাড়া তিনি হয়ত আমাদের চাইতে বয়সে কিছুটা বড়ো ছিলেন। কাজেই তিনি আজ বেঁচে আছেন

কিনা কে জানে। বর্তমানে সেখানে আমার বই গেলেও তাকে এই বইয়ের পাতা দেখে ঘটনাটি কে আর পড়ে শোনাবে? সেই রাখাল ভাইয়ের স্মৃতিটুকু, এই নাটকীয় ঘটনাটি আমার অন্তরের মণি-কোঠায় অতি যত্নে তোলা আছে। আজ তার কথা খুব বেশী ক'রে মনে হচ্ছে। যেভাবে শ্রীমতী উষারাণীর অতীত স্মৃতি উদ্ঘাটিত হয়েছে, সেভাবে সেই রাখালভাইয়ের দেখা হয়ত আমি আর কোনো দিনই পাব না। কেবল মাত্র তার মধুর স্মৃতি নিয়েই জীবনের শেষদিন ক'টি বেঁচে থাকতে হবে—তাঁর স্মৃতি আমাকে আনন্দ দেয়, তাতে আমি গর্ব অনুভব করি, আর সেই রাখাল-ভাইটির প্রতি আমার গভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি। জন্মান্তরবাদে আমার বিশ্বাস নেই, তা যদি থাকত তবে আমি মনে মনে এই কামনাই করতাম—জন্মজন্মান্তরে আমি যেন আমার সেই অনামী রাখালভাইকে চির সাথী হিসেবে পাই। হায়! আমার দরদী রাখালভাই তোমার স্মৃতি যেন আমি কোনো-দিন না ভুলি, তোমার সহৃদয়তার প্রতি আমার গভীর অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করি।

সেই পাহাড় থেকে বহু কষ্টে পথ ক'রে মাঠে এসেছি। রেল-লাইনের ওপর দিয়েও অনেকটা পথ অগ্রসর হয়েছি। রেল-লাইন থেকে নেমে চাঁদপুরের দিকে প্রসারিত রাস্তা ধরে চলেছি। এখন আমরা তিনজন ঘুরতে ঘুরতে বিস্তৃত সমুদ্রতীরে বালুকারাশির ওপরে এসে উপস্থিত হয়েছি। সামান্য এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ডিসেম্বর মাসে কি ভয়ানক শীত। একে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছি, তার ওপর বইছে বাতাস। এখন প্রায় ভোর চারটে বাজে। একটি ধুতি দু'জনে অর্ধেক অর্ধেক ক'রে পরেছি। কারো হয়ত বা একটি শার্ট আছে, কিন্তু তার না আছে হাতা, না আছে পকেট। কারো কাছেই চাদর প্রভৃতির বালাই নেই। তবে আমাদের প্রত্যেকের কাছেই একটি ক'রে রিভলভার ও অতিরিক্ত মাত্র একটি

জার্মান 'মজার' পিস্তল ছিল। আর কার্তুজও ছিল অনেক। এছাড়া একটি হাত-বোমাও আমাদের সঙ্গে ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সকাল হয়ে যাবে। এইসব কিভাবে সঙ্গে লুকিয়ে রাখব তাই নিয়ে ছিল যত ভাবনা। কোথায় একটুখানি আশ্রয় পাব? কার কাছে যাওয়া যায়? সকাল হবার আগেই কোনো না কোনো একটি ব্যবস্থা হবার প্রয়োজন। ইতিমধ্যে আমরা দু' জায়গায় চেষ্টা ক'রেও বিফল হয়েছি। তাদের একটু বাজিয়ে দেখেই সেই চেষ্টা থেকে বিরত হতে হয়েছে। একটি জেলে-নৌকার মাঝিকে বহুবার ডেকেছি। সে ভয়ে উত্তরই দিল না।

নিশান্তিকার হল অবসান। ক্রমে ক্রমে আলো ফুটতে লাগল। বেশ কিছুটা দূরে কয়েকটি বাড়িতে আলো জ্বলতে শুরু করেছে। দু'একজন কৃষকভাই হয়ত এদিক ওদিক আসা-যাওয়া করছে। সন্তর্পণে একটি বাড়ির নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখতে পেলাম জনৈকা বৃদ্ধা ও জনৈক প্রৌঢ়কে—যাকে বৃদ্ধ বললেও ভুল বলা হবে না। তাঁরা বাড়ির কম্পাউণ্ডের বাইরে বেরিয়ে আসছিল, হয়ত মুখ-হাত পা-ধুতে। আমরা ধীরে ধীরে তাদের কাছে গিয়ে একটি অজুহাত নিয়ে কথা পাড়লাম। চট্টগ্রামের ভাষাতেই বললাম যে, আমাদের বাড়ির মেয়েরা সমুদ্রপথে সীতাকুণ্ড তীর্থস্থানে যাবে ও ফিরে আসবে, তারা আমাদের সেইরূপ কোনো নৌকার সন্ধান দিতে পারেন কিনা। বৃদ্ধ মহিলাটি বেশ একটু রেগে গ্রাম্য ভাষায় ব্যঙ্গ ক'রে বললেন—"যত সব শয়তান! কেন, রেল নেই? মেয়েদের নিয়ে নৌকা ক'রে সীতাকুণ্ড যাওয়া হবে! শয়তানির আর জায়গা পাও নি······" ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রৌঢ় ব্যক্তিটি তখন বৃদ্ধাকে বললেন—"মা, তুমি এদের সঙ্গে এভাবে কথা বলছ কেন?" বৃদ্ধ-কৃষক ভাইটির মুখে এইরূপ একটি সহানুভূতিসূচক মনোভাবের প্রকাশ দেখে আমরা তাকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানালাম, তিনি যেন অনুগ্রহ ক'রে আমাদের একটু কথা শোনেন। তাঁকে একটু তফাতে

ডেকে নিয়ে বললাম—"দেখুন আমরা স্বদেশী। আমরা পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। আমাদের তিনজন মারা গেছে। আমরা এখন ফেরার। আমরা আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ইত্যাদি।

আমাদের আর কিছু বলতে হল না। তিনি তক্ষুনি বললেন, যেন তাঁকে আমরা অনুসরণ করি। নিঃশব্দে আমরা তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। তিনি বাড়ির পেছন দিক দিয়ে গিয়ে একটি একতলা মাটির দালানের পেছনে আমাদের দাঁড়াতে বললেন। আমরা তাঁর কথা মতো সেখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি চট্ ক'রে কোথা থেকে একটি চাষের জমি সমান করার মই নিয়ে এসে ঘরের দেওয়ালে ঠেকিয়ে রাখলেন এবং আমাদের বললেন, আমরা যেন সেই ঘরের ছাদের ওপর গিয়ে বসি আর যেন কোনো শব্দ না করি। ঘরের এই ছাদটিও আবার টিনের ছাউনি দিয়ে ঢাকা। আমরা একে একে নিঃশব্দে ওপরে উঠলাম। এইসব ঘটনা একটার পর একটা খুব তাড়াতাড়িই ঘটে গেল। এখানে সময়ে-অসময়ে ব্যবহারের জন্য বাড়ির নানা প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা ছিল। এই সবের মধ্যে কিছু মাটির কলসী হাঁড়ি প্রভৃতি ছিল।

আমরা শীতে খুব কাঁপছি, হঠাৎ দেখি একটি কাঁথা উড়ে এল। নিচ থেকে কৃষক-ভাইটি নিঃশব্দে ছুড়ে দিয়েছেন। তাঁর ঐরূপ দরদী মনের, পরিচয় পেয়ে আমাদের আরও ভালো লাগল। তাঁর দরদ দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম। তিনি আমাদের জামা-কাপড়ের অবস্থা লক্ষ্য করেছিলেন, আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে, আমরাও ভয়ানকভাবেই শীতে কাঁপছিলাম। একটিমাত্র কাঁথা, তাও কত ভাগ্যে জুটেছে। কিন্তু আমরা তো হলাম তিনজন। ভাবতে লাগলাম শরীর ঢাকব, না ঠাণ্ডা মেঝে থেকে পিঠ বাঁচাব। শেষে পিঠটাই বাঁচালাম।

বেলা তখন প্রায় দু'টো। বৃদ্ধ কৃষক-ভাইটি একটি ঝুড়িতে ক'রে ভাত-ডাল-তরিতরকারি আমাদের জন্য এনেছেন। তাঁকে অবশ্য

আমরা দেখতে পাই নি, দেখতে পেয়েছিলাম খাবার ঝুড়িটি ও মাত্র তাঁর দু'টো হাত। তিনি নিচে দাঁড়িয়ে খাবারের ঝুড়িটা হাতে তুলে ধরলেন। আমরা হাত বাড়িয়ে ঝুড়িটা নিয়ে নিলাম। ঝুড়িটির মধ্যে দেখলাম সব খাবার সাজানো আছে। খাওয়া-দাওয়ার পর বাসন-পত্রগুলো আবার খাবার ঝুড়িতেই রেখে দিলাম। দিন গেল, সন্ধ্যা হল, ক্রমে রাতও হল গভীর।

রাত তখন ঠিক বারোটা। বৃদ্ধ মইটি লাগিয়ে ঠেকা দিয়ে ধরে ফিসফিস ক'রে আমাদের নেমে আসতে বললেন। আমরা এক এক ক'রে নিঃশব্দে চোরের মতো নিচে নেমে এলাম। হাত-মুখ ধুলাম, মল-মূত্র ত্যাগ করলাম। রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পরই বৃদ্ধ-কৃষকভাই এই ব্যবস্থা করেছেন। সব কাজ সেরে আমরা আবার নিঃশব্দে চোরের মতো উঠে এলাম। বৃদ্ধ-কৃষকভাইটি এবারও নিঃশব্দে আমাদের ঝুড়ি ভরে খাবার দিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা পালা ক'রে ঘুমোলাম এবং পাহারা দিতে লাগলাম।

এইভাবে আমরা চার রাত্রি সেই টিনের চালের তলায় ছাদের ওপর কাটালাম। পঞ্চম রাত্রে আমরা বারোটা নাগাদ প্রতিদিনের মতো নিচে নেমে এলাম। প্রতিদিনের মতোই আজও মল-মূত্র ত্যাগ, হাত-পা ধোয়া ইত্যাদি কাজকর্ম শেষ করলাম। আজ আর আমাদের ওপরে উঠে যেতে হল না। আমাদের জন্য কৃষকভাইটি নৌকা ঠিক ক'রে রেখেছেন। আজ প্রায় রাত দু'টো নাগাদ জোয়ার আসবে আর তারপরেই আমরা জেলে নৌকা ক'রে সন্দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হব।

আজ তিনি তাঁর নিজের রান্না-খাওয়ার ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী স্বয়ং আমাদের নিজের হাতে পরিবেশন ক'রে খাওয়ালেন। বাংলাদেশের তিনি একজন স্নেহময়ী মা—সত্যই তাঁকে আমাদের মা জননী বলেই মনে হয়েছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের অন্তর ভরে উঠেছে। আমরা যখন খাচ্ছিলাম, তখন বৃদ্ধ কৃষকভাই খুব নিম্ন স্বরে দরদ দিয়ে প্রাণের অনেক কথাই বলছিলেন।

তিনি আবেগমাখানো কণ্ঠে বলতে লাগলেন—"তোমরা তিনটি কচি ছেলে। কত কষ্ট তোমরা করছ। তোমাদের মা-বাবা তোমাদের জন্য কত না চিন্তা করছেন। তোমরা তোমাদের মায়ের কোলে ফিরে যাও। আমার কত দুঃখ যে তোমাদের আমি ভালো ক'রে খাওয়াতে পারি নি, ভালোভাবে রাখতে পারি নি। আমার পরিবারে অন্যান্য যাঁরা আছেন, তাদের ওপর আমি একটুও ভরসা রাখতে পারি না। তাদের মধ্যে অনেকেই হচ্ছে চৌকিদার—দফাদার। এই বাড়িতে তোমরা যে আছ সে কথা আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া অন্য আর কাউকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিই নি। এই কদিন আমি আর আমার স্ত্রী অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় ও দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় কাটিয়েছি। আমার অবর্তমানে তোমাদের যদি কেউ দেখে ফেলত, তা হলে যা করার প্রয়োজন তা আমার স্ত্রীই করত। সবাইকে সামাল দেওয়ার দায়িত্ব তার ওপরেই ছিল।" এইসব কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বলতে লাগল—"তোমাদের ছেড়ে দিতে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না, তবু তোমাদের যেতে হবে। তোমরা এই বুড়োকে মনে রেখ বাবা।" তিনি আর বলতে পারলেন না, কান্নায় তিনি ভেঙে পড়লেন। আর তাঁর স্ত্রীও স্নেহভরা হৃদয়ে অনেক কথাই বলেছিলেন: "তোমরা বাবা আর বিপদের মধ্যে যেও না। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেও, ফিরে যেও তোমাদের মায়ের বুকে···।" তিনিও আর নিজেকে সংবরণ করতে পারেন নি—তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আমরা এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে কিছুই তখন বলতে পারছিলাম না। আমরা সবাই যেন ভাষা-হারা হয়ে পড়েছিলাম। তাঁদের ভাববিহ্বল অভিব্যক্তির জোয়ারে আমাদের কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে! আমরা কি বলতে কি বলেছি—আমাদের আবেগভরা মনের কথা কিভাবে তখন প্রকাশ পেয়েছে, তা এখন বলতে পারব না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হল। এখন বিদায়ের পালা। শত সহস্র হৃদয়ের আবেগ উছলে পড়ছিল। তাঁদের দু'জনকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করলাম। তাঁরা আমাদের অনেক অনেক আশীর্বাদ জানালেন। বৃদ্ধা-কৃষকভাইটি একে একে আমাদের তিনজনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। চোখের জলের মধ্যে শেষ হল এই বিদায়ের পর্ব। তাঁদের রান্নাঘর থেকে আমরা কৃষকভাইটিকে সাথে ক'রে বেরিয়ে এলাম। আসার সময় একটি সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি সজল নয়নে দুয়ারে দাঁড়িয়ে—দু'হাত তুলে আমাদের আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। যতক্ষণ আমরা তাঁর দৃষ্টিপথের মধ্যে ছিলাম, ততক্ষণ তিনি সেইখানেই ধীর-স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জানিনা কত চোখের জলই না তিনি আমাদের জন্য ফেলেছিলেন।

১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা, এই সুদীর্ঘকাল পরে ভাটিয়ারী সমুদ্রতীরের সেই বৃদ্ধ-কৃষাণভাই কি এখনও বেঁচে আছেন ? তাঁর আত্মীয়-স্বজন বা তাঁর বিশেষ বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিরা যদি তাঁর কাছ থেকে আমাদের প্রতি তাঁর ঐরূপ সাহায্য ও আশ্রয় দেবার নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা শুনে থাকেন এবং আমার বইয়ের লেখা থেকে তাঁর সেইরূপ কথার মিল খুঁজে পান, তাহলে তারা যদি তাঁর বাড়ির জীবিত ব্যক্তিদের সংবাদ দেন, তবে আমি বাধিত হব এবং সংবাদদাতাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

ঐ স্নেহময়ী জননীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমরা যখন ঐ বৃদ্ধ-কৃষকভাইটিকে নিয়ে রওনা হলাম তখন রাত প্রায় দু'টো। পূর্ব-বন্দোবস্ত অনুযায়ী জেলে নৌকাটি আমাদের তিনজন ও বৃদ্ধ-কৃষক-ভাইটিকে নিয়ে ছাড়ল—আমরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সন্দীপের উদ্দেশে রওনা হলাম। সন্দীপ থেকে বরিশাল স্টীমারে খুলনা এবং খুলনা থেকে ট্রেনযোগে কলকাতা যাওয়া ঠিক করেছি। ভাটিয়ারী সমুদ্রের উপকূল থেকে একটি বড়ো ধরনের জেলে-নৌকা ক'রে আমাদের এই সমুদ্রযাত্রা।

আমার ঘরে বসে আজ যখন আমি এই কাহিনী শোনাচ্ছিলাম, তখন আমার বন্ধুরা নির্বাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। তারা আমার কাছে আরও শুনতে ও জানতে চাইল। আমি তাদের বললাম, এইসব ইতিহাস আমি আগেই আমার বইতে লিখেছি। আজ কেবল এইরূপ কয়েকটি ঘটনার কথাই আমার মনে হচ্ছে। আমি ভাবছি বিলোনিয়ার সেই সুরেন-ভাইটির কথা। সুরেনের নামটি আমি বইতে লিখেছি। বিবরণ দিয়েছি আগরতলার রাজার সৈন্যরা যেখানে শিবির স্থাপন করেছিল, তার কাছেই ছিল তার একটি চাষের জমি। জমি থেকে তার বাড়ি প্রায় আধ-মাইল হবে। খড়ের কয়েকটি ঘর, একটি ঢেঁকিঘর ও বাড়ির সংলগ্ন একটি পুকুর। এই পুকুরটির তলায় বালি ছিল, কাদা নয়। তাঁর ঢেঁকিঘরে আমি কয়েকদিন ছিলাম। তারপর তাঁর সঙ্গে চৌদ্দগ্রাম পদব্রজে যাই এবং চৌদ্দগ্রামে আমরা তাঁর এক আত্মীয়ের কামারশালায় গিয়ে উঠি। সুরেন চৌদ্দগ্রাম থেকে কুমিল্লাগামী একটি যাত্রীবিহীন ও স্প্রিং ভাঙা বাসে আমাকে তুলে দিয়ে বিদায় নিলেন। সুরেনভাইয়ের বয়স আমার থেকে কিছু বেশী ছিল। জানি না আজও তিনি বেঁচে আছেন কিনা? তাঁর স্মৃতি আমার অন্তরে চির জাগ্রত আছে—থাকবেও।

নাগারখানা পাহাড়ের সেই রাখালভাইটির কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। ক্ষণিকের বন্ধু—সে এল, আমাদের পুলিশের কবল থেকে উদ্ধার করল। তারপর তার সঙ্গে আর আমাদের দেখা হল না। তার ঐটুকু পরিচয়ই আমি দিতে পারি, আর বেশী কিছু জানি না। এই ঘটনাটি তিনি যে কখনই ভুলতে পারবেন না, সে সম্বন্ধে আমি অন্তত নিঃসন্দেহ। তার সেইরূপ "ঘি-ঘি"···"বটগাছের আড়ালে তিনটি পিস্তল তাক্ ক'রে আছে দেখে ভয়ে বিহ্বল হওয়া" ···"ভয় নেই"···"চুপ ক'রে বসে থাকুন" ইত্যাদির ঘটনার বিবরণ তিনি কি আর কাউকে বলেন নি? আমার যখন বই ছাপা হল,

তখন নিশ্চয়ই সেই বইগুলো পূর্ব-পাকিস্তানে যায় নি। আজ যদি সেই নাগারখানা পাহাড়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে তাঁর কোনো আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব তাঁর মুখে সেই ঘটনাটি শুনে থাকেন এবং বাংলাদেশে আমার বইটি পড়ে যদি কেউ সেই রাখালভাই অথবা তাঁর পরিবারের কারো সম্বন্ধে কোনো খবর আমাকে দেন, তাহলে আমি তাদের কাছে চির-কৃতজ্ঞ থাকব।

জীবনে এই ধরনের আরও যে কত নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে, সে সব ঘটনা আমি কি ক'রে ভুলে যাব। ১৯শে এপ্রিলের রাত্রি বেলা থেকে ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত আনন্দের মা ও দিদির অপূর্ব কর্মতৎপরতা, ধীর-স্থির মস্তিষ্কে অত্যন্ত সাহস ও কৌশলের সঙ্গে বার বার পুলিশের আকস্মিক হামলা থেকে আমাদের বাঁচাবার কথা কি জীবনে ভুলতে পারব? আনন্দের বাবাকে সেই দিনই সকালে বন্দী করল। দেবু—আনন্দের দাদা তখন প্রধান বাহিনীর সঙ্গে পাহাড়ে আছে। প্রতিমুহূর্তে তারা ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণ আশংকা করছিল। আমরা চারজন বিচ্ছিন্ন হয়ে সেখানে আছি। প্রত্যেকের সঙ্গেই তখন দু'টো ক'রে রিভলভার। আনন্দের মা ও দিদি সব জেনেশুনে ও নিজেদের বিপদ বুঝেও কোনোরূপ নির্যাতনের ভয় না ক'রেই পুলিশকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং দু'বারই আমাদের পেছনের দরজা দিয়ে সুকৌশলে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন।

ভুলতে কি পারি রজতের মা-বাবার সাহস ও স্বার্থত্যাগের কথা? ১৮ই এপ্রিলের যুব-বিদ্রোহের পর আমরা চারজন মূল-বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর ২০শে এপ্রিল তাঁদের বাড়িতে এলাম। রজত আমাদের সঙ্গে ছিল না—সে মূল বাহিনীর সাথে তখন পাহাড় অঞ্চলে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের অপেক্ষায় আছে। আমাদের সঙ্গে তাদের ছেলেকেও দেখতে পাবেন বলে রজতের মা-বাবা স্বভাবতই আশা করেছিলেন। তারা জানেন না তাঁদের ছেলে এখন কোথায়। ছেলের খবর জানবার জন্য তাঁরা ব্যাকুল—ছেলের শুভ-অশুভ সম্বন্ধে

তাঁরা অনিশ্চিত। সেই কারণে রজতের অবর্তমানে তাদের মন অস্থির থাকা খুবই স্বাভাবিক। তবু তাঁরা আমাদের বিনা দ্বিধায় সঙ্গে সঙ্গে বরণ ক'রে নিলেন। আমাদের দলের ছেলেদের মধ্যে যাদের তাঁরা চিনতেন, তাদের প্রত্যেককেই তাঁরা নিজেদের ছেলের মতো মনে করতেন।

আমরা অতি সন্তর্পণে পেছনের দরজা দিয়ে তাঁদের বাড়িতে এসে প্রবেশ করলাম। তাঁরা তাঁদের ওপরের ঘর দুটোই আমাদের জন্য খালি ক'রে দিলেন। তার পরদিন সকালেই পুলিশদল রাইফেল উঁচিয়ে ও হাতে খোলা রিভলভার নিয়ে দু'বার ঝটিকাবেগে সে বাড়িতে এসে ঢুকেছে। খোলা রিভলভার হাতে কয়েকজন সার্জেণ্টের নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র পুলিশের দল বাড়িটিকে ঘেরাও করেছে। রজতের বাবার পিঠে দু'দুটো রিভলভারের নল ঠেকিয়ে আদেশ করেছে আগে আগে যেতে এবং তারা তাঁর পেছনে পেছনে এসে ঘরে ঢুকে তল্লাসী চালাচ্ছিল। আমরা পুলিশ আসার সংকেত পেয়েই ঘরের ভেতর দিকের তক্তাপাতা ছাদের ওপর চট ক'রে উঠে গেলাম। আমরা চারজন আটটি রিভলভার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলাম এবং কাঠের তক্তার ফাঁক দিয়ে সব কিছু লক্ষ্য করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই রজতের বাবাকে রিভলভারের সামনে রেখে পুলিশদল আমাদের এই ঘরটিতে এসে ঢুকল। তারা সবই তল্লাসী করেছে কিন্তু ওপর দিকে একটু তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারত যে চৌকো একটি তক্তা দিয়ে ওপরে ওঠার পথটি ঢেকে রাখা হয়েছে। কিন্তু পুলিশের চোখে তা পড়ল না। আমাদের আটটি রিভলভার তখন তাদের দিকে তাক্ ক'রে ছিল। আমরা চারজন রুদ্ধনিঃশ্বাসে বসেছিলাম। কি ভীষণ অবস্থা! পুলিশের অতগুলো রাইফেল, অতগুলো খোলা রিভলভার আর আমাদেরও আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি এবং মেশো-মশাইয়ের ঐরূপ অসহায় অবস্থা! তার জন্য ভেবে আমাদের রক্ত একেবারে জল হয়ে যাচ্ছিল। সেই শ্বাসরোধকারী মুহূর্তগুলো এখনও

মানসপটে ভেসে আছে। আর মনে আছে মেশোমশায়ের আত্মদানের মানসিক প্রস্তুতির কথা—তিনি যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রাণ দিয়ে হলেও আমাদের তিনি বাঁচাবেনই। প্রশ্ন হল, প্রাণ দিয়েও কি আমাদের বাঁচানো সম্ভব হ'ত? ছোট একটি ঘর। ভেতরে ছাদের সিলিংয়ের ওপর তৈরী ঘরে বসে আছি আর দশ বারোজন পুলিশের উদ্যত রাইফেল ও রিভলভারের হাত থেকে বাঁচা কি সম্ভব? যদি এক বারের জন্যও তাদের কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করত ঐ ছোট চোরা পথের দিকে, তবে কি রক্ষা ছিল?

মেশোমশাই একজন প্রখ্যাত উকিল। তিনি যতদূর সম্ভব পুলিশের দলকে বিভ্রান্ত করার জন্য সুচতুরভাবে সফল অভিনয় করলেন। বাহাদুর পুলিশ। ঘরের আনাচে কানাচে সব জায়গাই তারা দেখল, দেখল না শুধু মাথার ওপরে তক্তা পাতা সেই চোরা পথটি। আমার জীবনে সেইরূপ ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার ঘটনার নজির আর একটিও নেই। সন্ধ্যে হবার পর সেই দিনই আমরা মাসীমা ও মেশোমশাইয়ের অজস্র চোখের জলের মধ্যে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

আমার সহবন্দী শ্রোতাদের এরপর আমি বললাম—আর ভাই কত বলব। ছোটখাট আরও কত ঘটনা আছে। একেবারে চরম মুহূর্তেও বিভিন্ন জেল সিপাইরা একেবারে সরাসরি রিভলভার হাতে যেন ধরা না পড়ে যাই, তারজন্য আমায় সাহায্য করেছেন। এইসব জীবনের ঐতিহাসিক ছোট ছোট ঘটনা বহু কষ্ট ও নিদারুণ অভিজ্ঞতার মূল্যবান সঞ্চয়। এতলোকের দয়া, আমার প্রতি তাদের অসীম করুণা এবং অন্তরের স্নেহমমতা এবং আশীর্বাদ আমি যদি না পেতাম তবে আমার পক্ষে কি পুলিশের চক্রান্ত, অভিসন্ধি ও অতর্কিত আক্রমণ ব্যর্থ ক'রে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল?

"পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচ-কেনা
আর চলিবে না।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে ফুরায় সত্যের যত পুঁজি
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি—
'তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।' "

॥ ৮ ॥

আমার ক্ষুদ্র জীবন-নাট্যের এইসব চাঞ্চল্যকর দুঃসাহসিক ও শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার বিবরণ পাশাপাশি রেখে যারাই বিচার করবেন, তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কি মনে হবে না যে, এই শ্রেণীর ঘটনার বাস্তবতার মধ্যে ফেণীর সেই নাবালিকা ঊষারাণীর ঘটনা একেবারেই বেমানান? যে যেভাবে দেখবে বা যার যেরূপ দেখার ক্ষমতা সেটা হল তার একেবারে নিজস্ব জিনিস। যে সব দুর্দান্ত, ভয়ঙ্কর ও অবিশ্বাস্য ঘটনার স্মৃতি আমার অন্তরে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানো আছে, সেই শ্রেণীর মধ্যে বালিকা ঊষার করুণামাখা চরিত্র ও দীনদরিদ্রজনের প্রতি তার নিঃস্বার্থ কর্তব্যের প্রেরণার আদর্শ আমার স্মৃতির প্রথম শ্রেণীতেই নিবদ্ধ হয়ে আছে।

নাগারখানা পাহাড়ের সেই রাখাল-ভাইটির পুলিশের বন্দুক উপেক্ষা ক'রে ও বিপদ মাথায় নিয়ে আমাদের উদ্ধার করা এবং বালিকা ঊষারাণীর আমাকে এক মুষ্টি অন্নদান কি এক?

পুলিশের উদ্যত রাইফেল বেষ্টিত ও পিঠে রিভলভারের নল ঠেকানো অবস্থায় আমাদের মেশোমশাই—রঞ্জনবাবু যেভাবে পুলিশকে বিভ্রান্ত ক'রে আমাদের রক্ষা করেছিলেন তার সঙ্গে বালিকা ঊষা-রাণীর স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষুধার্ত অতিথি-সেবা কি সমপর্যায়ভুক্ত?

আমার পরিচয় জেনেও আমাকে ধরিয়ে না দিয়ে বিলোনিয়ার সুরেনভাই তার নিজগৃহে আমাকে কয়েক দিনের জন্য আশ্রয় দেওয়া এবং চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে কুমিল্লার বাসে তুলে দেওয়ার সঙ্গে কি বালিকা উষার করুণামাখা দরদী মনের পরিচয়টির তুলনা করা চলে ?

বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ পরিবেষ্টিত হয়েও ভাটিয়ারী সমুদ্রতীরের সেই বৃদ্ধ-কৃষকভাই ও আমাদের সেই স্নেহময়ী কৃষক-জননী যেভাবে নিজেদের বিপন্ন ক'রেও আমাদের আশ্রয় দিয়ে ছিলেন ও প্রাণ রক্ষা করেছিলেন, তা কি বলিকা ঊষার মমতা, সহৃদয়তা, উপস্থিত বালক-বালিকার মধ্যে তার বৈশিষ্ট্যের সুলক্ষণগুলো কি এক হল—এক-পাল্লায় মেপে কি তার মূল্য নির্ধারণ করা যায় ?

আগেই বলেছি, সেইরূপ যাচাইয়ের ফল আপাত-দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন হবে—তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু নাগারখানা পাহাড়ের সেই রাখালভাই, সমুদ্রতীরের বৃদ্ধ-কৃষক, বিলোনিয়ার সুরেনভাই, রজতের মা-বাবা, আনন্দের মা ও দিদি—(যদিও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে অনেক মা-বাবাই তাঁদের ছেলেদের সন্ত্রাস-মূলক কার্যকলাপের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন), তবু নিদারুণ সংকট মুহূর্তে উল্লেখিৎ সবাই যুক্তি তর্কের দ্বারা নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে কোনোরূপ বিশ্লেষণ না করেই, শ্রীমতী ঊষারই মতো, তাঁরাও সবাই এক নিমেষেই ভীষণ বিপদ মাথায় নিয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। বয়স যাই হোক না কেন, বালিকা ঊষার মতো অতি অল্প বয়স থেকেই তাদের অন্তঃকরণও দরদপূর্ণ নিঃস্বার্থপরায়ণ ছিল, সেই কারণেই তাঁদের আর আমাদের সাহায্য করার শুভকাজে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয় নি।

বালিকা ঊষা যদি স্বতঃস্ফূর্ত দরদী মনের স্বাভাবিক অধিকারিণী না হ'ত, আর যদি কোনো হৃদয়হীনা মেয়ের হাতে আমি সেই বাড়িতে পড়ে যেতাম, তবে যে আমাকে কি নিদারুণ অশুভ পরিণতির সম্মুখীন

হতে হ'ত—তা ভাবাই যায় না। হৃদয়হীনা ও দরদবিহীন একটি ছোট মেয়ে আমাকে সেখানে সেই অবস্থায় এবং সেই বেশে দেখামাত্র তাড়িয়ে দিতে যে চাইত না, তা কে বলতে পারে? হয়ত সেইরূপ কোনো নির্দয় বালিকা হাঁকডাক দিয়ে বাড়ির বড়োদের ডেকে "পাগলটিকে" বের করে দেবার বন্দোবস্ত করত। কে বলতে পারে সেই বাড়ির অভ্যন্তরে সেই সময় ঘটনাচক্রে কোনো পুলিশের লোক বা পুলিশে চাকরি করে এমন আত্মীয় উপস্থিত নেই? এইরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই বালিকা ঊষার অবদানকে বিচার ক'রে দেখলে বোঝা যাবে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

আমি এ বিষয়টি আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলি। শ্রীমতী ঊষা যখন একটি বালিকা মাত্র, তখন তার মধ্যে দেখেছি একজন দুখীর দুখে সমবেদনা, সে জনৈক পাগল-অভুক্তকে কিছু আহার্য দিয়েছিল কিন্তু এসবের কোনো কিছুই তো সে সজ্ঞানে করে নি—সে তখন জানতই না যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক অনন্ত সিংহের বিপদে সে সাহায্য করছে। আজ যখন সে নিজে এবং আমরা সবাই জেনেছি, সেইদিন বালিকা ঊষা ছদ্মবেশী অভুক্ত অনন্ত সিংহের বিপদে ও তার অত্যন্ত প্রয়োজনে সাহায্য করেছিল, সেই জন্যই কি ঊষার সেই স্বতঃস্ফূর্ত 'দয়া দাক্ষিণ্য'কে তার স্বদেশপ্রেম ব'লে আখ্যা দিতে হবে? এইরূপ সংস্কারদুষ্ট প্রশ্ন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির গণ্ডিকে হয়ত সংকীর্ণ ও খুব সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাখবে। আমার সেই জেলসাথী যখন আমাকে ঐ অংশটুকু পড়তে শুনল, কেবলমাত্র বীরোচিত যুদ্ধে বিপ্লবী সৈনিকের চরম আত্মত্যাগের আদর্শই সব নয়, কেবল বীরোচিত অমর-গাথায় রচিত ভারতের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না; দরদী সমর্থকদের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষ অবদানের মধ্যে যদি বীরোচিত চাকচিক্যের অভাব থাকে, তবু সেই সবের মূল্য কম মনে ক'রে আমরা সেগুলোকে অস্বীকার করতে পারি না। আমার এরূপ দৃঢ়মত শুনেও দেখলাম বন্ধুটির মনে অনেক প্রশ্ন রয়ে গেল। তাই

আমি বললাম, "তুমি বোধহয় ভাবছ, 'টেগরার জীবনদান' ও 'দরদী সমর্থকদের সাহায্য' এক কি ক'রে হবে—তা তো হতেই পারে না ?" সে আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জোরের সঙ্গে বলে উঠল—"No ! Never—Certainly not ! তা কখনও এক হতে পারে না।" আমার যুবক বন্ধুর এইরূপ বদ্ধ ধারণার বিরুদ্ধে তক্ষুনি আমার বক্তব্যের সমর্থনে আর কিছু বলা সমীচীন হবে না বলে চুপ ক'রে গেলাম।

দিন দুই পরে সকালবেলা সে আমার সেলে একা এসেছে। তাকে একেবারে, একা পেয়ে খুব শান্ত পরিবেশে আগের দিনের সেই প্রসঙ্গটি তুলে ধীরে ধীরে আমি তাকে বলতে লাগলাম : "তুমি আগের দিন খুব জোরের সঙ্গে বলেছিলে, শহীদদের আত্মদান ও দরদী সমর্থক-দের স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহায্য প্রভৃতি পৃথক বস্তু—এরূপ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন জিনিসকে এক নিক্তিতে ওজন করা যায় না—একই পর্যায়ে তাদের মূল্যায়ন হতে পারে না। এতে তোমার যুক্তি হয়ত আছে, যদি দারুণ গোঁড়ামির মনোবৃত্তি নিয়ে এই প্রশ্নের বিচার করি। তবে সে সম্বন্ধে আমার আর একটু বলার আছে।

"তোমার কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল, তুমি আগে থেকেই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ভেবেছ, যেন আমি বলতে চাইছি, 'বালিকা উষা' ও 'টেগরা'র বিপ্লবী অবদান এক। দেখ তোমাকে একটু বলি—যদি তোমার জীবনে সেইরূপ কোনো বাস্তব ঘটনা একটি ঘটে থাকত, যেমনভাবে রজতের বাবা—শ্রীরঞ্জনলাল সেন, একজন পুরোদস্তুর সংসারী হয়েও রিভলভারের গুলি উপেক্ষা ক'রে চরম স্বার্থত্যাগে ব্রতী হয়ে আমাদের বাঁচিয়েছিলেন, তবে তুমি কখনই 'সশস্ত্র যুদ্ধে' বিপ্লবী যুবকের প্রত্যক্ষ অংশ নেওয়া, আর 'অন্য দিকের পাল্লায়' ঘোর সংসারী—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পরিবেষ্টিত ও তাদের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়েও, ঘোর বিপদ মাথায় নিয়ে তার অক্ষয় আদর্শ স্থাপন করাকে তুমি জালালাবাদের বীর সৈনিকদের 'বীরত্ব ও আত্মদানকে' পৃথক ক'রে

দেখতে পারতে না। এই সঙ্গে আরও একটু মনে রাখলে ভালো হবে, সশস্ত্র সংগ্রামের বীর সৈনিকেরা সবাই আর মৃত্যুঞ্জয়ী টেগরা বল নয়। মেশিনগানের গুলি শ্রাবণের ধারার মতো আসছিল—গুলি কারো বুকে লেগেছে আর না হয় কাউকে স্পর্শ করে নি। জালালাবাদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে আসার পর যে সব বিপ্লবী যোদ্ধারা বেঁচে রইলেন, তাদের পরবর্তী জীবনের কথা আমাদের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে। আবার এই ঘটনাও আমাদের জানা দরকার জালালাবাদ থেকে আমাদের খোঁজ নিতে যে সব সাথীরা শহরে এসেছিল, সবাই তারা যুদ্ধ ক'রে অমরেন্দ্র নন্দীর মতো গৌরবময় মৃত্যুবরণ করে নি। তাদের অনেকেই বাড়ি এসেই বাড়ির 'সুবোধ বালক' হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এরাই যদি সেই পাহাড়ের যুদ্ধে গুলির আঘাতে মারা যেত, তবে তাদের শহীদ না হয়ে আর উপায় ছিল না। আমার বক্তব্য হল—বিবেকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীনতার জন্য মৃত্যু-পাগল হওয়াই অগ্নিযুগের ছিল অগ্নিপরীক্ষা। কারা অগ্নিযুগের সেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে বা না হয়েছে, তার বিচার ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। আমার এই ধরনের উক্তি বহু প্রাক্তন বিপ্লবী সাথী ও পূজনীয়রা সহ্য করতে হয়ত পারবেন না। আমার এই ধরনের উক্তিকে তারা হয়ত একটি বিকৃত চিন্তা দিয়ে বিচার ক'রে আমাকে বলবেন—অহংকারী আর এইরূপ বিশ্লেষণকে বলা হবে আমার ঔদ্ধত্য আমি বাংলার বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করেছি। তাঁদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, তারা যেন ভুল না বোঝেন—সামগ্রিক বৈপ্লবিক ঐতিহ্য বা বিশেষ বিশেষ সার্থক বিপ্লবীদের স্বদেশপ্রেম ও বীরত্বের অমৃতগাথা কোনো মতে কোনো দিনই ক্ষুণ্ণ বা ম্লান হতে পারে না যদি আমরা অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের ও তাঁদের সংগঠনের সকল দুর্বলতা, ভুল, ত্রুটি বিচ্যুতি নির্ভিকভাবে আলোচনা করি। যদি ভবিষ্যৎ প্রগতিশীল ইতিহাস রচনার পথে আমাদের মতো পুরোনো দিনের বিপ্লবীদের কোনো নিঃস্বার্থ কর্তব্য এখনও কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে আমাদের

অতীত কর্মকাণ্ডের দুর্বলতা ঢেকে রেখে, মিথ্যা মহত্ত্বের ও তথাকথিত সাহসের বড়াই ক'রে সেই কর্তব্য পালন করা যাবে না। মিথ্যা বড়াই, মিথ্যা দম্ভ, মিথ্যা ঐতিহ্যের প্রচার, আমাদের মতো প্রাক্তন বিপ্লবীদের বিপ্লবী মুখোশের আবরণে হয়ত কিছুটা ব্যবসা করা যায়, কিন্তু তা কখনও প্রগতির গতিপথে যথার্থ কর্তব্য বা বিপ্লবী দায়িত্ব পালন করা হয়েছে ব'লে গণ্য হবে না—হতে পারে না।

এইরূপ কর্তব্যপরায়ণ মন নিয়ে আমাদের সব অতীত ত্রুটি-বিচ্যুতি আমরা বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে দেখব এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বড়ো ছোট সব অবদানই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব এবং ইতিহাসের পাতায় সেসবেরও বিশেষ স্থান থাকুক, তা আমরা সর্বান্তঃকরণে চাইব। আমি বলতে চাইছি—'মুক্তিযোদ্ধার' প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সঙ্গে 'মহান সমর্থকদের' বিশেষ কীর্তি ও অবদান সম্বন্ধে মূল্যায়ন হয়ত করা যায়, তবু প্রশ্ন থাকে, দু'টি ভিন্ন ধরনের বীরত্ব ও কাজের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করা কি সম্ভব ?

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে বিপ্লবী দরদীবন্ধুদের সমষ্টিগত মহান কীর্তির কথা। কে কতখানি স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং কে কতখানি তাঁর বিপ্লবী কীর্তি রেখে যাওয়ার জন্য সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন—সেটি বিচার ক'রে বিভিন্নজনের বিভিন্ন মূল্য নির্ধারণ আমরা হয়ত নিশ্চয়ই করব। তাতে কেউ শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হবেন তাও ঠিক—যেমন নাকি সূর্য সেন, যতীন মুখার্জী, কানাইলাল প্রমুখ মহান বিপ্লবী নায়কেরা ভারতের স্বাধীনতার গৌরবময় ইতিহাসের পাতা সমুজ্জ্বল ক'রে রেখেছেন। কিন্তু বাস্তব সত্যটি আমাদের বুঝতে হবেই যে, কেবলমাত্র কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারই কোনো বৃহৎ প্রকল্প, মিল বা খনি চালু রাখতে পারে না, যদি নাকি শ্রমিকের সমগ্র শক্তি তাতে নিয়োজিত না হয়। সেরূপ আবার সৈন্যাধ্যক্ষরাই কেবল যুদ্ধ করে না এবং কেবলমাত্র তাদের প্রচেষ্টার ওপরেই জয়-পরাজয় নির্ভর করে না। সার্বিক জয় বা

পরাজয় নির্ভর করে সমষ্টিগত সৈন্যদল সমাবেশের ওপর এবং আরও বেশী নির্ভর করে সারা দেশের ব্যাপক জনগণের সমর্থন, সহানুভূতি ও সাহায্যের ওপর এবং সর্বোপরি নির্ভর করে তাদের ভুল বা নির্ভুল মতাদর্শের ওপর। তাই আমরা কেবলমাত্র বিপ্লবী নেতাদের এবং প্রথম সারির বিপ্লবী-কর্মীদের সাহস, বিক্রম ও ত্যাগের রোমাঞ্চকর গাথাই রচনা করব না, আমাদের দরদ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সংগ্রহ করতে হবে সবরকম ছোটবড়ো তথ্য—প্রত্যেকের ক্ষুদ্রতম বৈপ্লবিক অবদান। সবার সমষ্টিগত শক্তি ও বিভিন্ন প্রকারের অবদান একত্রে মিলিত হয়েছিল বলেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

আমার সহবন্দীভাইটিকে আরও বললাম—উষার ঐটুকু সাহায্য পাওয়ার মাত্র পাঁচ দিন আগে—২০ ও ২১শে এপ্রিলের নিদারুণ বাস্তব অভিজ্ঞতা তখনও আমার মানসপটে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও জাগ্রত ছিল। ২০শে এপ্রিল আমরা চারজন আনন্দদের বাড়িতে সকালে খাওয়ার টেবিলে প্রাতরাশের জন্যে অপেক্ষা করছি আর আমরা আমাদের আটটি পিস্তল পরিষ্কার ক'রে তেল দিয়ে মুছে রাখার ব্যবস্থা করছিলাম। ঠিক তখনই ডাক শোনা গেল: "মা আসছে।" খোকন, আনন্দের ছোট ভাই, ফেণীর সেই ছোট মেয়ে উষার মতো সেও একটি ন'-দশ বছরের বালকমাত্র। সে-ই ছুটে এসে খবর দিল, "মা আসছে," অর্থাৎ পুলিশ আসছে। আনন্দদের বাড়িটি ছোট্ট একটি টিলার ওপর। এই ছোট্ট টিলাটির নিচে বড়ো রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত রাস্তাটি দেখা যায়। সে পুলিশ আসতে দেখে ছুটে এসে এই ভয়ানক সংবাদটি মাকে দিল। আমাদের আর চা খাওয়া হল না। পুলিশ এসে ঢোকার মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগে খিড়কি দিয়ে এই বাড়ি পরিত্যাগ ক'রে পেছনের পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলাম।

আবার তার পরের দিন, ১৯৩০ সালের ২১শে, এপ্রিল-প্রাতে আমরা রজতদের বাড়ির দোতলায় আত্মগোপন ক'রে আছি। রজতের ছোট ছোট পাঁচটি ভাইবোন। তাদের মধ্যে সবার বড়োটি

বয়সে বালিকা উষার মতোই হবে। তার বয়স বছর দশেকের বেশী তো নয়ই। তারা মাসীমার নির্দেশ মতো বাড়ির সামনে বড়ো উঠোনের মধ্যে 'খেলা করছিল' আর তারা দৃষ্টি রাখছিল বাড়িতে আসার সোজা সরু পথটির ওপর। হঠাৎ তারা সমবেত কণ্ঠে পূর্ব-নির্ধারিত একটি গান শুরু করল। এটাই ছিল পুলিশ আসার একটি সংকেত। তাছাড়াও তাদের মধ্য থেকে একজন ছুটে এসে মাকে খবর দিল— পুলিশ আসছে। মাসীমা আমাদের ঘরটিতে একেবারে ছুটে এলেন। তিনি ছোট একটি টেবিল একটানে এনে তক্তাপাতা ছাদে ওঠবার চোরা পথের নিচে রাখলেন। আমরা বিদ্যুৎগতিতে ছাদের ওপরে গিয়ে লুকালাম। মাসীমা আবার টেবিলটি সরিয়ে দেওয়ালের একপাশে সরিয়ে নিচে নেমে গেলেন। এরপরের লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ আগেই আমি দিয়েছি।

আনন্দের ছোটভাই ছোট্‌কোন্ আর রজতের ছোট ছোট এই পাঁচটি ভাইবোনের কি-ই বা বুদ্ধি ছিল। সেই অল্প বয়সে কতখানিই বা তাদের জ্ঞান হয়েছে। রজতের ভাইবোনেরা আমাদের তো দেখেই নি। তাদের মধ্যে বড়ো তিনভাই বোধহয় আমাদের সেখানে অবস্থিতির কথা মায়ের কাছ থেকে জেনেছে। কিন্তু তখনও মাসীমা আমরা কে কে বা ক'জন সেখানে ছিলাম, তা তাদের বলে নি। ছোট্‌কোন্ আর এইসব ছোট ছোট ভাইবোনেদের বিশেষ কোনো বুদ্ধি থাকুক আর না-ই থাকুক, তবু তারা স্বতঃস্ফূর্ত বালসুলভ জ্ঞানের অনুভূতি দিয়ে, 'ভালো কি মন্দ কাজ,' তারাও বালিকা উষার মতোই পরখ ক'রে নিয়েছিল একমুহূর্তেই। পুলিশ আসছে কিনা তারা তা লক্ষ্য রেখেছে এবং তা মাকে এসে ঠিক সময়মতো জানিয়েও গেল। আমরা খুব সহজেই পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে গেলাম। এই ছোট ছোট বালক-বালিকার ছোট অবদানগুলো কি ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে না? ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তারাও কি যথার্থ স্থান পাবে না? এইরূপ অভিজ্ঞতার

পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীমতী উষার বালিকা বয়সের স্বতঃস্ফূর্ত সুলক্ষণাদির অমৃতধারার উৎস আমি খুঁজে পেয়েছিলাম—আনন্দের ছোটভাইয়ের ক্ষুদ্র কর্মতৎপরতার মধ্যে—আবিষ্কার করেছিলাম রজতের ছোট ছোট ভাইবোনেদের সৎ-প্রবৃত্তির নির্ঝরিণীর মধ্যে।

আমার জীবনে এরূপ মহামূল্য অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধশালী হয়েছে, যখন তুলনামূলকভাবে বিচার করেছি সে সময়ের ন'-দশ বছরের বালিকা উষার মতো আর একটি—ছোট মেয়ের একেবারে বিপরীত মানসিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে। আমাদেরই অগ্নিযুগের যুবক বন্ধু, যে আজ আর এই পৃথিবীতে নেই—ব্রিটিশের ফাঁসীর মঞ্চে যে বিপ্লবের জয়গান গেয়ে গৌরবময় মৃত্যু বরণ করেছে, তারই একটি ন'-দশ বছরের ভাগনী বাবার কাছে মামার বিরুদ্ধে লাগাল—'মামা বোমা তৈরী করার সময় দুর্ঘটনায় পুড়ে গিয়ে ভীষণ আহত হয়েছে।' এই বালিকার পিতা, অর্থাৎ অগ্নিদগ্ধ সেই বন্ধুর ভগ্নীপতি ছিলেন একজন সরকারী চাকুরে। তিনি তাঁর কর্তব্য করলেন। মেয়ের কাছে শুনে পুলিশের কাছে গিয়ে রিপোর্ট দিলেন। আমাদের সংগঠনকে এই কারণে নিদারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমন কি অগ্নিদগ্ধ যুবকটিকে খুঁজে বার করার জন্য পুলিশের তৎপরতা এত বেশী বেড়ে গিয়েছিল যে, আমরা প্রতি মুহূর্তে ভয় করেছি, চট্টগ্রাম যুবক অভ্যুত্থানের সব পরিকল্পনাই বোধহয় বানচাল হয়ে গেল। কোনো মতে সমস্ত বিপদ অতিক্রম ক'রেও শেষপর্যন্ত আমরা ব্রিটিশ শাসিত চট্টগ্রাম বন্দর-নগরীটি অধিকার করতে সমর্থ হই। তারপর আমাদের বিরুদ্ধে যখন মামলা চলছিল, সে সময় ন'-দশ বছরের সেই বালিকা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিয়ে গেল।

আরও বলি শোন তবে। আমাদের এক দরদী বিধবা মাসীমা সাবিত্রীদেবী তার একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে নিয়ে নিজের বাড়িতেই থাকতেন। তিনি তার বাড়িতেই আশ্রয় দিয়েছেন চট্টগ্রামের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের। রাতের পর রাত জেগে তিনিও

পাহারা দিতেন। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী সম্মিলিত শক্তি নিয়ে একরাত্রে সে বাড়িতে হানা দিল। যুদ্ধ হল। সৈন্যবাহিনীর ক্যাপটেন সাহেব মারা গেলেন। দু'জন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে গৌরবময় মৃত্যুবরণ করলেন। আর অন্যান্য কয়েকজন পুলিশ ও সৈন্যদের বেষ্টনী ভেদ ক'রে চলে যেতে সমর্থ হলেন। তার মধ্যে মাস্টারদা ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দার ছিলেন। মা ও ছেলেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ছেড়ে দিল। সেই মেয়েটি পুলিশের কৃপাপাত্রী হল।

ছেলে ও মা জেলে বন্দী আছেন। তাঁদের জেলের মধ্যে নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল। ছেলের পায়ে লোহার 'ডাণ্ডা বেড়ী' পরানো হল। সে তখন খুবই অসুস্থ। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তবুও খোলা হল না তাঁর পায়ের বেড়ী। ছেলে নিজের শেষমুহূর্তে মায়ের সঙ্গে দেখা করার আকুল ইচ্ছা জানাল। মা ছেলের মুমূর্ষু অবস্থায় ছেলেকে দেখতে চাইলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শয়তানরা সে সুযোগ তাঁদের দিল না। ছেলেটি মারা গেল। তখনও তাঁর পায়ে রয়েছে লোহার 'ডাণ্ডা-বেড়ী'। কিন্তু হায়! একি ইতিহাসের পরিহাস! যে মেয়ের মা ও ভাই জেলে—ভাই জেলের মধ্যে 'ডাণ্ডা বেড়ী' পরা অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় প্রাণ দিল, এমন কি মৃত্যুকালেও যার ভাইকে ব্রিটিশ শাসক মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিল না, সেই মেয়ে সেই ব্রিটিশ সরকারেরই কৃপাপাত্রী! এমন মহীয়সী মাসীমার এমন মেয়ে! ইতিহাসে এই ধরনের ব্যতিক্রমও আছে—অপূর্ব মনোরম প্রাণ মাতানো সংগীতের সুরেও মাঝে মাঝে ছন্দ পতন ঘটে! এরূপ দৃষ্টান্তও ইতিহাসের আবর্জনায় স্থান পাবে, স্থান পাবে নরেন গোঁসাইদের পাশেই।

আনন্দের ছোট ভাই, রজতের ছোট ছোট ভাই বোনেরা, ফেণীর সেই ছোট্ট মেয়েটি আমার জীবনে যেরূপ বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সাহায্য করেছে, সেরূপ আবার ঐ দুটি মেয়ের বিরূপ ও বেদনা-

দায়ক আচরণ ও অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার বাস্তব শিক্ষাও আমি গ্রহণ করেছি।

ইতিহাসের অগ্রগতির গতিপথে বিলোনিয়ার সেই স্বরেন, ভাটিয়ারী সমুদ্রতীরের সেই বৃদ্ধ কৃষকভাই, সশস্ত্র পুলিশবেষ্টিত নাগারখানা পাহাড়ের সেই রাখালভাই, রজতের মা-বাবা, আনন্দের মা ও দিদি আর স্নেহের বোন উষাও তার বালিকা বয়সে স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন বিপ্লবী সৈনিককে বিপদের চরম মুহূর্তে সাহায্য করেছে। এইভাবে ইতিহাসের প্রত্যেকটি পাতাই আমাদের বিচার ক'রে দেখতে হবে।

শ্রীমতী উষা তার অমায়িক স্বভাবের জন্য নিজে কখনই বলতে চায় না বা দাবী করে না যে, সে এমন কিছু একটা করেছে, যার জন্য তাকে প্রশংসা করতে হবে। সেইদিন উষার সঙ্গে জেলে আমার সাক্ষাতের সময় যখন আমার সহবন্দীরা শ্রীমতী উষাকে ফুলের তোড়া দিচ্ছিল এবং তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল, তখন উষা তাদের বার বার সবিনয়ে বলছিল—"আমাকে কেন ভাই তোমরা অভিনন্দন জানাচ্ছ? আমি তো সেদিন না জেনেই একজন ভিখারী ও ক্ষুধার্তকে মাত্র কয়েক মুষ্টি খেতে দিয়েছি। এতে অভিনন্দন বা প্রশংসা পাওয়ার তো কিছুই নেই। অবশ্য আজ যখন জেনেছি যে, সেইদিন আমার অজ্ঞাতেই যাঁকে খেতে দিয়ে ছিলাম তিনি আর কেউ নয়—আমার এই দাদাটিই, তখন তাঁর বিপদের সময় সাহায্য করার আমার যে সৌভাগ্য হয়েছিল, সেইটিই হল আমার সবচাইতে বড়ো পুরস্কার। আমার তো আর কিছুর প্রয়োজন নেই। এই সম্পদই আমার জীবনে একটি অমূল্য ও গৌরবময় রত্ন স্বরূপ হয়ে থাকবে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধে একজন বিপ্লবী সৈনিকের একান্ত প্রয়োজনে তাঁর সেবায় অংশ গ্রহণের সুযোগ আমিও পেয়েছিলাম।" এই বলতে উষার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল—সে আর বলতে পারল না, চোখের জলের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠল তার অন্তরের সমস্ত অভিব্যক্তি।

———